জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথা

জ্যোতির্বিদ্যার সাক্ষরতা বিষয়ক প্রস্তাবনা

জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথা

জ্যোতির্বিদ্যার সাক্ষরতা বিষয়ক প্রস্তাবনা

রচয়িতা

João Retre (Institute of Astrophysics and Space Sciences, Portugal), Pedro Russo (Leiden University, the Netherlands), Hyunju Lee (Smithsonian Science Education Center, USA), Eduardo Penteado (Museu de Astronomia e Ciências Afins, Brazil), Saeed Salimpour (Deakin University, Australia), Michael Fitzgerald (Edith Cowan University, Australia), Jaya Ramchandani (The Story Of Foundation), Markus Pössel (Haus der Astronomie, Germany), Cecilia Scorza (Ludwig Maximilians University of Munich & Haus der Astronomie, Germany), Lars Lindberg Christensen (European Southern Observatory), Erik Arends (Leiden University, the Netherlands), Stephen Pompea (NOAO, USA), Wouter Schrier (Leiden University, the Netherlands)

ডিজাইন : Aneta Margraf-Druc (ScienceNow/Leiden University)
লে-আউট: Aneta Margraf-Druc (ScienceNow/Leiden University), Carmen Müllerthann (Haus der Astronomie/Office of Astronomy for Education)

অনুবাদ

বাংলা অনুবাদ টিম: সার্বিক সম্পাদনা, পরিমার্জন, অনুবাদ ও তত্ত্বাবধান: ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী; সম্পাদনা সহযোগী: শুভ্রদেব বিশ্বাস, শাফায়েত রহমান; সংকলন: শাফায়েত রহমান; অনুবাদ: ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, অর্ণব রায়, আতিকা রহমান, হারুন অর রশিদ, জুবায়েদ হোসেন, মীর সাখাওয়াত হোসেন, কাজী মাহফুজা তাসনিম, সৌরভ মণি বিশ্বাস, শাফায়েত রহমান, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, কামরুল কাদের চৌধুরী।

অনুবাদ ও সম্পাদনা টিমের পক্ষে, ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, প্রচারে: নক-বিডি অফিস, আই.এ.ইউ., বাংলাদেশ । প্রকাশকাল জুন, ২০২০।

ISBN/EAN: 978-94-91760-26-6
লাইসেন্স: ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশন 4.0 আন্তর্জাতিক (CC BY 4.0)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Ismael Tereno (Institute of Astrophysics and Space Sciences), Pedro Figueira (European Southern Observatory), Sérgio Pereira (Institute of Astrophysics and Space Sciences), Monica Bobra (Stanford University), Piero Bienvenuti (Università di Padova) and Roy Bishop (Acadia University) for their comments to this version of the goals. João Retrê acknowledges financial support from the Portuguese Science and Technology Foundation through research grants IA-09-2017BGCT and UID/FIS/2013/04434. Pedro Russo acknowledges support from the NAOJ Sokendai project "Astronomy Literacy" coordinated by Prof. Dr. Hidehiko Agata. NOAO is operated by the Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), Inc. under cooperative agreement with the National Science Foundation. We would also like to acknowledge the community for their feedback on this document during the review process.

জ্যোতির্বিজ্ঞান সাক্ষরতা লক্ষ্য এটি লাইডেন মানমন্দির, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় (নেদারল্যান্ডস) এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রফিজিক্স অ্যান্ড স্পেস সায়েন্সেজ (পর্তুগাল) এর একটি যৌথ প্রকল্প যা আইএইউ কমিশন সি-১ (সাক্ষরতা এবং কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কার্যকর গ্রুপ-এর কর্মপরিধির আওতাধীন।

আইএইউ কমিশন সি-১ অ্যাস্ট্রনমি এডুকেশোন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট: সভাপতি
আইএইউ কমিশন সি-১ : সাক্ষরতা এবং কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কার্যকর জোট: আহ্বায়ক

জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথা' আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থার অফিস অফ অ্যাস্ট্রনমি ফর এডুকেশনের একটি প্রকল্প

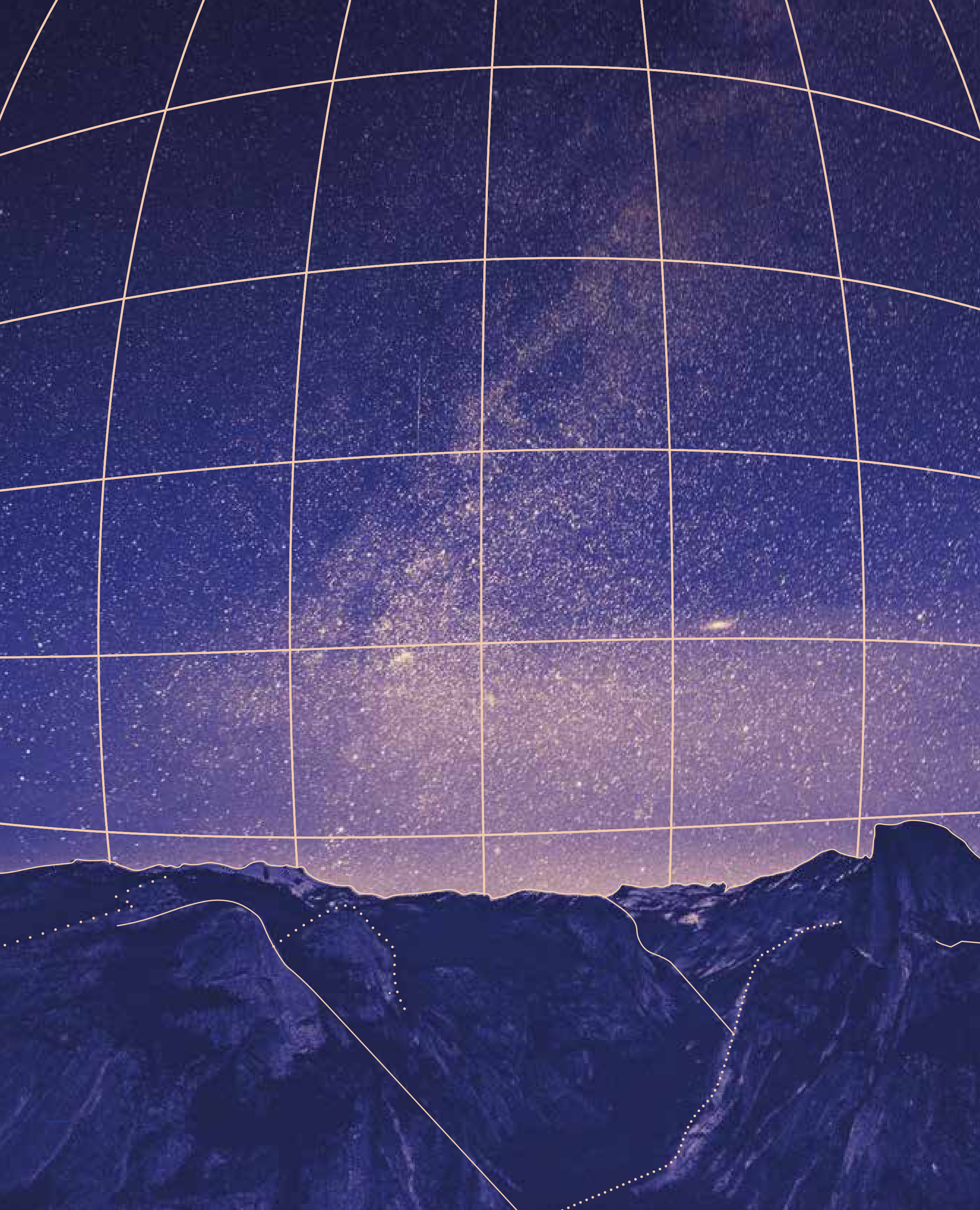

সূচি

০৬ জরুরি ভাবনা

০৮ সূচনা

১০ জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১২ মোদ্দাকথার বিষদ-ভাবনা

১৮ ১. জ্যোতির্বিদ্যা মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম।

২২ ২. অনেক মহাজাগতিক ঘটনাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ।

২৬ ৩. রাতের আকাশ বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং গতিময়।

৩০ ৪. জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন জোতিষ্ক এবং মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে।

৩৪ ৫. জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ঋদ্ধ হয় এবং তাকে ত্বরান্বিত করে।

৩৮ ৬. মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার বিজ্ঞানই কসমোলোজি।

৪৪ ৭. সৌরজগতের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের সবার বসবাস।

৪৮ ৮. আমরা সবাই নক্ষত্রধূলি দিয়ে তৈরি।

৫৪ ৯. মহাবিশ্বে নিখর্ব সংখ্যক (কয়েক শত বিলিয়ন) নক্ষত্র রয়েছে।

৬০ ১০. এই মহাবিশ্বে আমরা সম্ভবত নিঃসঙ্গ নই।

৬৪ ১১. এই মহাবিশ্বে পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান, একে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

জরুরি ভাবনা

১ জ্যোতির্বিদ্যা মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম।

২ অনেক মহাজাগতিক ঘটনাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ।

৩ রাতের আকাশ বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং গতিময়।

৪ জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন জোতিষ্ক এবং মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে।

৫ জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ঋদ্ধ হয় এবং তাকে ত্বরান্বিত করে।

৬ মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার বিজ্ঞানই কসমোলোজি।

৭ সৌরজগতের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের সবার বসবাস।

৮ আমরা সবাই নক্ষত্রধূলি দিয়ে তৈরি।

৯ মহাবিশ্বে নিখর্ব সংখ্যক (কয়েক শত বিলিয়ন) নক্ষত্র রয়েছে।

১০ এই মহাবিশ্বে আমরা সম্ভবত নিঃসঙ্গ নই।

১১ এই মহাবিশ্বে পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান, একে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

সূচনা

সবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা

উপরে লেখা বাক্যটি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন(IAU) এর আওতাভূক্ত অফিস অভ অ্যাস্ট্রনমি আউটরিচ অফিসের মূলমন্ত্র। সমাজ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিবিধ সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য যদি “সমস্ত” একটি বিস্তৃত শব্দ হয়, তবে জ্ঞানের একটি অঙ্গ হিসাবে “জ্যোতির্বিজ্ঞানও” একইভাবে বিশাল বিষয়। “বিগ আইডিয়াজ ইন অ্যাস্ট্রনমি” বা “জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথা” প্রকল্পটি অন্বেষণ করে যে: “পৃথিবীর অধিবাসীদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কী জানা উচিত”? এখানে ১১টি মূল পয়েন্ট আছে এবং প্রতিটির অধীনে আছে উপধারা ও তাদের বিস্তারিত বিবরণ। শিক্ষাবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য এই ডকুমেন্টটি তৈরি করা হয়েছে, তাঁদের শিক্ষাদান , প্রশিক্ষণ, অধিবেশন পরিচালনা, প্রচার কার্যক্রমে বা রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা উচিত, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য একটি পথপ্রদর্শক দলিল হিসেবে এ ডকুমেন্টটিকে বিবেচনা করা যায়। সে যাইহোক, এটি একটি পরিবর্তনশীল ডকুমেন্ট হতে পারে, এবং এ বিষয়ে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী , জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা চর্চাকারী এবং বিজ্ঞান শিক্ষাবিদদের মন্তব্য এবং বক্তব্যকে স্বাগত জানাই। বেশ কয়েকটি বির্তক সভা, আলোচনা সভা, কর্মশালা, উপস্থাপনা এবং পাঠ মিথস্ক্রিয়ার শেষে, আমরা এক সেট "বিগ আইডিয়াস ইন অ্যাস্ট্রোনমি" প্রস্তাব করি ,যা জ্যোতির্বিজ্ঞান সাক্ষরতার একটি প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বলা যেতে পারে। জ্যোতির্বিদ্যা সর্ম্পকে আমাদের গ্রহের অধিবাসীদের কী কী জানা উচিত, এই ডকুমেন্টটি সেই "বিগ আইডিয়াস" বা জরুরি ভাবনাগুলির এবং এর আনুষঙ্গিক ধারণাগুলি জানানোর প্রচেষ্টা।

পরবর্তী ধাপ

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল কোনো একটি গবেষণা প্রকল্পের অধীনে এই ডকুমেন্টটিকে ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে এর উন্নতিসাধন করা যাতে জ্যোতির্বিদ্যার অক্ষরপরিচয় করানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা যা যথার্থ মনে করেন, এটি যেন তদ্রূপ হয়। এই ধারাক্রমে, এখন আমাদের কাজ হচ্ছেঃ এই জরুরি ভাবনা বা মোদ্দাকথার আলোকে শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক উপকরণ গাইড এবং যথাযথ মূল্যায়ণ কৌশল শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন এবং নীতি-নির্ধারণী পলিসি প্রতিবেদন তৈরি করা। '২০২০-২০৩০ IAU কৌশলগত পরিকল্পনা' বিশ্বব্যাপি জ্যোতির্বিদ্যা কার্যক্রমে জ্যোতির্বিদ্যা-শিক্ষাকে মূল-কেন্দ্রে রেখেছে। জ্যোতির্বিদ্যা পাঠদানকে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা হিসেবে বিবেচনার জন্য IAU তাদের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে। আমরা আশা করছি যে, এই ডকুমেন্টটি জ্যোতির্বিদ্যার অক্ষরপরিচয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বিশ্লেষণ ও চিন্তা-কাঠামো গঠন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং তার উদ্দেশ্য সাধন করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথা

ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যারা আগ্রহী, যাঁরা কাজ করেন, পড়াশোনা করেন, বুঝতে চান, শিখতে চান - তাঁদের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য এটা একটা দরকারি ডকুমেন্ট। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা এই ডকুমেন্টটি তৈরি করেছে জ্যোতির্বিদ্যায় সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। বিজ্ঞান সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে যেমন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন কয়েকটি ধারণাগত স্টেটমেন্ট তৈরি করেছে, এটিও তদ্রূপ। এখানে ১১টি মূল পয়েন্ট আছে। প্রতিটির অধীনে আছে ৫-৭টি উপধারা এবং তাদের বিস্তারিত বিবরণ। এগারোটি ধারায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল স্তম্ভকে সংক্ষেপে তুলে আনা হয়েছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে এবং এদের উপধারায় বর্ণিত প্রস্তাবনাগুলি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই বর্ণনাগুলিই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষরতার সাথে বিজড়িত কোর কনসেপ্ট। অতএব, এই আন্তর্জাতিক ইশতেহারটি অনুধাবন ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

জ্যোতির্বিদ্যার মোদ্দাকথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পেদ্রো রুসো

"জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশসহ মহাজাগতিক সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি সহজ মনে হলেও, মহাবিশ্ব আসলে বিশাল, যেখানে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, ও বয়সের মহাজাগতিক বস্তু এবং আশ্চর্যজনক প্রপঞ্চে পূর্ণ। মানুষের সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা ও দর্শনে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বারবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অতীতে, সময় পরিমাপ বা বিশাল মহাসাগরে দিক নির্ণয়ে জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ হত। বর্তমানে, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলে কম্পিউটার, যোগাযোগ উপগ্রহ , দিকনির্ণয় যন্ত্র, সৌর প্যানেল, তারবিহীন ইন্টারনেটসহ আরও নানাধরনের প্রযুক্তি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকাংশে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

অন্য যেকোনও বিজ্ঞানের মতোই জ্যোতির্বিজ্ঞানও জ্ঞান আহরণের ফলে উন্নতি সাধন করেছে। সৌরজগতের সৌরকেন্দ্রিক দর্শন এবং বিগ ব্যাং মডেলের বৈপ্লবিক ধারণার মত হঠাৎ-পাওয়া যুগান্তকারী সাফল্য, প্রযুক্তি ও চিন্তার জগতের ধীরগতির অগ্রগতিকে মাঝে মাঝে ত্বরান্বিত করে। বিগ ব্যাং মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশের গল্প বলে। প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর আগে, সদ্যোজাত ""মহাবিশ্ব"" ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং অতি উত্তপ্ত ছিল। একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ ও সেইসাথে গতিশীল প্রসারণ এবং পরবর্তীতে ক্রমাগত শীতল হওয়ার ফলে মৌলিক এবং অবপারমাণবিক কণা তৈরি হয়, যা পরে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের সূচনা করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বের প্রসারণ মূলত ডার্ক এনার্জি নামক একটি রহস্যময় শক্তির কারণে হচ্ছে। আমরা যদি রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আলোর রেখাগুচ্ছ দেখতে পাই। আমাদের দেখা রাতের আকাশের তারা এবং আলোক রেখাগুচ্ছ আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের অংশ। গ্যালাক্সিগুলো প্রায়শ: সুতাকৃতির ফিলামেন্ট এবং দলবদ্ধ গুচ্ছের মধ্যে তৈরি হয়, আর এর বাইরে থাকে মহাবিশ্বের বিশাল ফাঁকা শূন্যস্থান। আমাদের ছায়াপথে কয়েকশো বিলিয়ন তারা রয়েছে, যার মধ্যে সূর্য একটি, সমুদ্র সৈকতে একটি বালির দানার মতই অকিঞ্চিৎকর। এই নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষের প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে, ছায়াপথের কেন্দ্রের প্রকাণ্ড কৃষ্ণবিবরকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। মহাবিশ্বের এই মহাশূন্যে আছে অনেকগুলো দ্বীপ-সদৃশ গ্যালাক্সি; শত-বিলিয়ন গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের এই একটিমাত্র 'দ্বীপে' জনবসতি রয়েছে। যদিও সূর্য একটি তুলনামূলকভাবে গড় প্রকৃতির নক্ষত্র, আমরা জানতাম সূর্যই একমাত্র গ্রহ দ্বারা পরিবেষ্টিত নক্ষত্র, উপভোগ্য সূর্যের সাথে আমাদের জন্যও এটি ছিল বিশেষ মর্যাদার। বর্তমানে আমরা হাজার হাজার নক্ষত্রের গ্রহ সম্পর্কে জানি, যাদের এক্সোপ্লানেট বলা হয়। দেখা গেছে, ২০% এর বেশি নক্ষত্র সূর্যের মতোই যাদের কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরছে, এই গ্রহগুলোর বেশকিছুর সাথে পৃথিবীর মিল রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি গ্রহ ছোট এবং তাদের নক্ষত্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে প্রদক্ষিণ করছে, যা তরল জলের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়, অত:পর প্রাণের সম্ভাবনাকেও। কিন্তু মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি? যে সব উপাদানগুলো দেখা যায় - গ্রহ, তারা, গ্যালাক্সি- সব কিছুই প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন এবং কোয়ার্ক নামক পদার্থ দিয়ে তৈরি (বিজ্ঞানীরা এগুলোকে ""ব্যারিয়নিক পদার্থ"" বলেন), কিন্তু এখানে বিশাল, অদ্ভুত, রহস্যময় কিছুও রয়েছে এবং এটি

পর্তুগিজ ভাষায় প্রকাশিত একটি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত

কী তা কেউ জানে না। নক্ষত্রগুলো গ্যালাক্সির কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করবে আশা করা হয়, যেভাবে সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের নিকটতম গ্রহগুলি অধিকতর দূববর্তী গ্রহগুলির চেয়ে দ্রুত ঘোরে। কিন্তু, গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে এমন ঘটে না- কক্ষপথ ছোট হোক বা বড় হোক, নক্ষত্রগুলো একই গতিবেগে ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। অবশ্যই, নক্ষত্রগুলো প্রদক্ষিণ করার জন্য এমন কিছু আছে যা আমরা দেখতে পাই না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে ""ডার্ক ম্যাটার"" বলে অভিহিত করেছে। ধারণা করা হয় যে আমরা যা দেখতে পাই তা হল মহাবিশ্বে বিদ্যমান সমস্ত কিছুর ছোট্ট একটি অংশ। অন্য বড় অংশটুকু ভালভাবে বোঝা এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়নি এখনো। জ্যোতির্বিজ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে নয়, এটি আমাদের সীমিত আকাশপ্রান্তকে আরও প্রশস্ত করার, মহাবিশ্বের সৌন্দর্য, মহিমা এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান সর্ম্পকে জানার সুযোগ করে দেয়। এই দৃষ্টিকোণ - যাকে ""মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি"" বলা যায় – মানবতার প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহত্তম অবদানগুলির অন্যতম।"

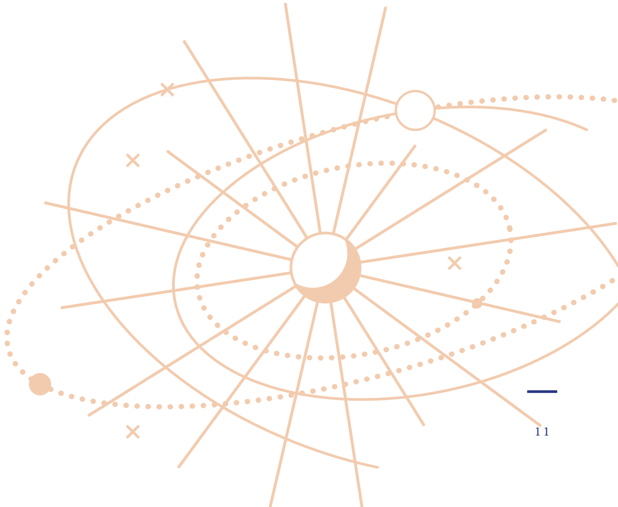

মোদ্দাকথার বিষদ-ভাবনা

১ জ্যোতির্বিদ্যা মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম।

১.১ আকাশ এবং সূর্য ও গ্রহসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ছিল ভৌতজগত অনুধাবনের প্রথম প্রচেষ্টা।

১.২ প্রাচীন সমাজে রাতের আকাশের বিবিধ নক্ষত্রকে নিয়ে কাল্পনিক নকশা প্রচলিত ছিল।

১.৩ দুনিয়াজোড়া নানা সভ্যতার আর্ট ও কালচারে উদ্দীপনা জুগিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পরিবর্তে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়াদি ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞান সময় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গণনায় সাহায্য করে, যা প্রাচীন কৃষির জন্য অপরিহার্য ছিল।

১.৫ অতীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান দিক-নির্দেশনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যা জোতিষশাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

১.৭ বেশির ভাগ প্রাচীন সভ্যতায় পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র বলে বিশ্বাস করা হত।

১.৮ একশো বছরের প্রচেষ্টায় কোপার্নিকান বিপ্লব সৌরজগতের কেন্দ্রে পৃথিবীর বদলে সূর্যকে প্রতিস্থাপন করেছে।

১.৯ প্রায় চারশত বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম প্রণালীবদ্ধ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন।

১.১০ পৃথিবী নামক গ্রহটির আকৃতি প্রায় বর্তুল আকৃতির এবং বহু শতাব্দী ধরে তা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত ছিল।

২ অনেক মহাজাগতিক ঘটনাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ।

২.১ পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে বলে আমরা দিন ও রাতের পার্থক্য বুঝতে পারি।

২.২ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী এক বছরে একবার ঘুরে আসে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের আনতির কারণে আমরা ঋতুর পার্থক্য বুঝতে পারি।

২.৩ আমরা চন্দ্রচক্র জুড়ে চাঁদের বিভিন্ন দশা দেখতে পাই।

২.৪ পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের বিশেষ অবস্থানের কারণে গ্রহণ সংঘটিত হয়।

২.৫ সূর্য ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ জনিত আকর্ষণের কারণে পৃথিবীতে জোয়ারভাটা হয়।

২.৬ পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের জন্য সূর্যের আলো অপরিহার্য।

২.৭ পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন কণার কারণে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়।

২.৮ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও অংশ।

৩ রাতের আকাশ বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং গতিময়।

৩.১ অন্ধকার মেঘমুক্ত রাতের আকাশে আমরা কয়েক হাজার তারা খালি চোখে দেখতে পাই।

৩.২ রাতের আকাশ দেখে পৃথিবীতে নিজের অবস্থান জানা যায় [অরিয়েন্টেশন, দিক- সচেতনতা] এবং যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা [নেভিগেশন] পাওয়া যায়।

৩.৩ কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের দোলাচল ঘটে (অয়নচলন)।

৩.৪ সূর্য দিগন্তের উপরে থাকলে খালি চোখে মাত্র গুটিকয়েক জোতিষ্ক দেখা যায়।

৩.৫ পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে জ্যোতিষ্কগুলো (গ্রহ/নক্ষত্র) পুবাকাশে উঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

৩.৬ তারার মিটমিট করে জ্বলার কারণ হল আমাদের বায়ুমণ্ডল।

৩.৭ প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন উল্কাপিন্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

৪ জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন জোতিষ্ক এবং মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে।

৪.১ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রধান উৎস আলো যা একপ্রকার বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ।

৪.২ বৃহৎ পরিসরে মহাকর্ষ হলো মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিথস্ক্রিয়া।

৪.৩ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এবং অবপারমাণবিক কণা এই মহাবিশ্বকে বোঝার নয়া তরিকা দেয়।

৪.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক তাত্ত্বিক অবকাঠামোতে বিবিধ [আকাশ] পর্যবেক্ষণ এবং কম্পিউটার সিমুলেশন থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ব্যবহার করে নানাবিধ মহাজাগতিক ঘটনার মডেল নির্মাণ করা হয়।

৪.৫ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে আহৃত জ্ঞান ব্যবহার করা হয়। যেমন: পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান।

৪.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিশেষায়িত শাখা আছে।

৪.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞানে সময় ও দূরত্বের যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত স্কেল থেকে অনেক বড়।

৪.৮ বর্ণালিমিতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা এই মহাবিশ্বকে দূর থেকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে।

৫ জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ঋদ্ধ হয় এবং তাকে ত্বরান্বিত করে।

৫.১ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য টেলিস্কোপ এবং ডিটেক্টর অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

৫.২ কোনো কোনো টেলিস্কোপকে একত্রে সংযুক্ত করে একটি বড় টেলিস্কোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫.৩ পৃথিবী এবং মহাশূণ্যের বিভিন্ন জায়গায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দির রয়েছে।

৫.৪ পৃথিবীস্থ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্ত ও নির্জন অঞ্চলে অবস্থিত।

৫.৫ বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান „বিগ সায়েন্স“ ও „বিগ ডেটা“র অংশ!

৫.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞানের জটিল সিমুলেশন এবং প্রচুর পরিমাণে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারের উন্নয়ন প্রয়োজন।

৫.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি বৈশ্বিক বিজ্ঞান যেখানে অনেক আন্তঃদেশীয় গবেষক দল কাজ করে এবং যেখানে ডেটা ও পাবলিকেশন মুক্তভাবে আদানপ্রদান করা হয়।

৫.৮ সৌরজগতকে বোঝার জন্য মহাকাশে অসংখ্য মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে।

৬ মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার বিজ্ঞানই কসমোলোজি।

৬.১ এই মহাবিশ্বের বয়স তের'শ কোটি বছরের বেশি।

৬.২ মহাবিশ্ব ব্যাপক পরিসরে সমসত্ব ও দিকনিরপেক্ষ।

৬.৩ আমরা সর্বদা অতীত পর্যবেক্ষণ করি।

৬.৪ আমরা গোটা মহাবিশ্বের শুধুমাত্র একটি খণ্ডাংশ দেখতে পাই।

৬.৫ মহাবিশ্ব মূলত ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দ্বারা নির্মিত।

৬.৬ মহাবিশ্ব ত্বরিত হারে প্রসারিত হচ্ছে।

৬.৭ মহাশূণ্যের প্রসারণের ফলে দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর রক্তিম সরণ ঘটে।

৬.৮ প্রাকৃতিক বিধিসমূহ (যেমন মহাকর্ষ) পৃথিবীতে যেমন, তেমনি মহাবিশ্বের সব জায়গায় একইভাবে কাজ করে।

৬.৯ ব্যাপক পরিসরে মহাবিশ্বের কাঠামো ফিলামেন্ট, শিট এবং ভয়েড দ্বারা গঠিত।

৬.১০ অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ [কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড] আমাদেরকে আদি মহাবিশ্ব বুঝতে সাহায্য করে।

৬.১১ মহাবিশ্বের বিবর্তন বিগব্যাং মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

৭ সৌরজগতের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের সবার বসবাস।

৭.১ আমাদের সৌরজগত আনুমানিক ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল।

৭.২ সৌরজগত সূর্য, গ্রহ, বামন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং তুষারিত বস্তু দ্বারা গঠিত।

৭.৩ সৌরজগতে আটটি গ্রহ রয়েছে।

৭.৪ সৌরজগতে বেশ কয়েকটি বামন গ্রহ রয়েছে।

৭.৫ সৌরজগতের গ্রহসমূহ দুইভাগে বিভক্ত -- পাথুরে গ্রহ এবং গ্যাস দানব।

৭.৬ কিছু গ্রহের কয়েক ডজনের মত প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

৭.৭ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তনরত তৃতীয় গ্রহ এবং চাঁদ এর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ।

৭.৮ লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু রয়েছে যারা সৌরজগতের আদি গঠনের অবশেষ।

৭.৯ ধূমকেতু একটি তুষারিত বস্তু, এটি যখন সূর্যের কাছে আসে তখন সৌরতাপের কারণে এর একটি গ্যাসীয় পুচ্ছ দেখা যায়।

৭.১০ সৌরজগতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলটির নাম হেলিওপজ (সৌরবিরতি)।

৮ আমরা সবাই নক্ষত্রধূলি দিয়ে তৈরি।

৮.১ নক্ষত্র হল একটি স্বদীপ্ত কায়া যা অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে।

৮.২ ধূলা ও গ্যাসের অতিকায় মেঘ থেকে নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়।

৮.৩ পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটি সূর্য।

৮.৪ সূর্য একটি সদা পরিবর্তনশীল নক্ষত্র।

৮.৫ নক্ষত্রের রং থেকে তার পৃষ্ঠ তাপমাত্রার হদিস পাওয়া যায়।

৮.৬ দুটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে সাধারণত অত্যন্ত ফাঁকা স্থান থাকে অথবা এর মাঝে গ্যাসের মেঘ থাকতে পারে- যেখান থেকে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিতে পারে।

৮.৭ নক্ষত্রের একটি জীবনচক্র থাকে যা তার প্রাথমিক ভর দ্বারা নির্ণীত হয়।

৮.৮ অতি ভারী নক্ষত্রগুলো কৃষ্ণবিবর (নাক্ষত্রিক) হিসেবে জীবনচক্র সমাপ্ত করে।

৮.৯ নতুন নক্ষত্র এবং তাদের গ্রহমন্ডলী ঐ অঞ্চলের পূর্বতন নক্ষত্রের ধ্বংসাবশিষ্ট বস্তু থেকে জন্ম নেয়।

৮.১০ মানবদেহস্থ পরমাণুগুলির উৎস পূর্বতন নক্ষত্রগুলোতে পাওয়া যেতে পারে।

৯ মহাবিশ্বে নিখর্ব সংখ্যক (কয়েক শত বিলিয়ন) নক্ষত্র রয়েছে।

৯.১ গ্যালাক্সি হল নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং গ্যাসের একটি বৃহৎ সমাহার।

৯.২ গ্যালাক্সি বিপুল পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার ধারণ করে।

৯.৩ গ্যালাক্সির গঠন একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া।

৯.৪ গ্যালাক্সি মূলত তিন ধরণেরঃ কুণ্ডলিত, উপবৃত্তাকার এবং অনিয়মিত।

৯.৫ আমরা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নামের একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সিতে বসবাস করি।

৯.৬ গ্যালাক্সির কুণ্ডলিত বাহু গ্যাস এবং ধূলিকণা জমা হয়ে গঠিত হয়।

৯.৭ বেশিরভাগ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি অতিভারী কৃষ্ণবিবর থাকে।

৯.৮ গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে বহুদূরে অবস্থিত হতে পারে।

৯.৯ গ্যালাক্সিগুলো ক্লাস্টার বা গুচ্ছকারে থাকে।

৯.১০ গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের সাথে মহাকর্ষ বলের দ্বারা মিথস্ক্রিয়া করে।

১০ এই মহাবিশ্বে আমরা সম্ভবত নিঃসঙ্গ নই।

১০.১ পৃথিবীর বাইরেও জৈব অণু সনাক্ত করা হয়েছে।

১০.২ পৃথিবীর অনেক চরমভাবাপন্ন পরিবেশেও জৈবসত্তার বেঁচে থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

১০.৩ মঙ্গল গ্রহে সম্ভাব্য তরল পানির সন্ধান আদিম প্রাণসত্তার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

১০.৪ সৌরজগতের কিছু প্রাকৃতিক উপগ্রহে প্রাণের উপযোগী অনুকূল শর্ত উপস্থিত।

১০.৫ সূর্য ছাড়াও অন্য নক্ষত্রকে ঘিরে প্রচুর গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, এদেরকে বাহ্যগ্রহ বলে।

১০.৬ বাহ্যগ্রহগুলো অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় এবং প্রায়ই এরা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে।

১০.৭ আমরা এখন পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ শনাক্তকরণের কাছাকাছি চলে এসেছি।

১০.৮ বিজ্ঞানীরা অপার্থিব বুদ্ধিমত্তার সন্ধান করছেন।

১১ এই মহাবিশ্বে পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান, একে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

১১.১ আলোক দূষণ মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে।

১১.২ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রচুর মানব সৃষ্ট বর্জ্য বিদ্যমান।

১১.৩ মহাশূন্যে সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তুসমূহের উপর আমরা নজর রাখছি।

১১.৪ পৃথিবীর পরিবেশের উপর মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

১১.৫ মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা জলবায়ু এবং বায়ুমন্ডল ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

১১.৬ আমাদের গ্রহটির সংরক্ষণে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন।

১১.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের একটি অনন্য মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দেয়, যা পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

১ জ্যোতির্বিদ্যা মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম।

ল্যাস্কো'র প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রঃ এখানে বন্যজন্তুটির পিঠের দিকে একগুচ্ছ ডট কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী নির্দেশ করছে।

ছবি সৌজন্যে – Ministère de la Culture/ Centre National de la Préhistoire/Norbert Aujoulat

১.১ আকাশ এবং সূর্য ও গ্রহসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ছিল ভৌতজগত অনুধাবনের প্রথম প্রচেষ্টা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অঙ্কন (ড্রইং) এবং বস্ত্রশিল্প থেকে। আকাশে তারা যা দেখেছে তার প্রতিফলন সেগুলিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সমাজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়াদি ছিল বিভিন্ন পুরাণ (মিথ) বা ধর্মীয় ও আচারিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলি ব্যবহার করে সময় গণনা এবং পঞ্জিকা তৈরি করা হতো,যা প্রাচীন সমাজে দৈনিক ও ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি পরিকল্পনায় সহায়ক ছিল।

১.২ প্রাচীন সমাজে রাতের আকাশের বিবিধ নক্ষত্রকে নিয়ে কাল্পনিক নকশা প্রচলিত ছিল।

রাতের আকাশের তারাগুলোকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে সংযুক্ত করে যে নকশা কল্পনা করা হতো তাদেরকে তারামণ্ডলী বা কনস্টেলেশন বলে। বহু প্রাচীন সংস্কৃতির মানুষেরা আদিতম তারামণ্ডলীর কল্পনা করে গেছে। এইভাবে শনাক্তকৃত তারাদের দলকে বিভিন্ন সমাজের মানুষের [যেমন গ্রিক, মায়া, নেটিভ আমেরিকান ও চৈনিক সভ্যতার] লৌকিক কাহিনি এবং পৌরাণিক গল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাতের আকাশের সুচিহ্নিত অঞ্চলসমূহ তারামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতম পরিচিত তারামণ্ডলী এবং আরো আছে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিহ্নিত তারামণ্ডলী। দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের মতো কোনো কোনো প্রাচীন সংস্কৃতিতে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের উজ্জ্বল ব্যান্ডের ভেতরকার অন্ধকার কালো অঞ্চলকে নিয়েও নকশা কল্পিত আছে।

১.৩ দুনিয়াজোড়া নানা সভ্যতার আর্ট ও কালচারে উদ্দীপনা জুগিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পরিবর্তে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়াদি ব্যবহৃত হয়েছে।

বহু শতাব্দী ধরে লেখক, কবি, শিল্পী এবং সৃজনশীল ও চিন্তাবিদ মানুষেরা তাঁদের সৃষ্টিতে রাতের আকাশকে হয় ব্যবহার করেছেন অথবা এর দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়েছেন। বিভিন্ন শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, সঙ্গীত এবং সাহিত্যে আমরা মহাকাশ বিষয়ক থিম দেখতে পাই। এইসব সৃজনশীল কর্মে রাতের নানা দৃষ্টিগ্রাহ্য মোটিফকে ব্যবহার করে রাতের আকাশের রোমাঞ্চ, সৌন্দর্য, রহস্য, মর্ম প্রকাশ করা হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষে। আর্টের বিশ্বজনীনতা এবং মানুষের অন্তর্গত সংস্কৃতির সাথে এর অন্তর্লীন সম্পর্কের কারণে এটা মানুষের উপর একটা শক্তিশালী ও গভীর প্রভাব ফেলে। এর ফলে মানুষ যে শুধু জ্যোতিষ্কদের সৌন্দর্য আর মহাজাগতিক প্রপঞ্চের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে তা নয়, বরঞ্চ ঐ বিষয়ক লব্ধজ্ঞানও তাঁকে বিস্মিত করে। এটা বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষকে আগ্রহী করে তোলে এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ও ত্বরান্বিত করে, কেননা এই বোধ খুব শক্তিশালী যে-- আমাদের একটাই আকাশ।

১.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞান সময় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গণনায় সাহায্য করে, যা প্রাচীন কৃষির জন্য অপরিহার্য ছিল।

অনেক প্রাচীন সভ্যতায় কৃষি-পঞ্জিকার শুদ্ধতা আনতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ও বিকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, আকাশের লুব্ধক নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরে পঞ্জিকা চালু ছিল, কেননা ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে তারা নীলনদে বার্ষিক বন্যার আগাম পূর্বাভাস দিত।

১.৫ অতীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান দিক-নির্দেশনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অনেক সভ্যতাতেই নক্ষত্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ব্যবহার করে স্থল, জল এবং মহাসমুদ্রে গতিপথ নির্ধারণ করা হতো। মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ থেকে দিকনির্দেশনা আজো পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

১.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যা জোতিষশাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রাক-আধুনিক কাল পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পার্থক্য বেশ অস্পষ্ট ছিল। আজকাল এই পার্থক্য একদমই নেই, এই দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়বস্তু। জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি বিকশিত বিজ্ঞান, এবং জ্যোতিষশাস্ত্র কোনো বিজ্ঞানই নয়। জ্যোতিষ্কদের অবস্থান বিবেচনা করে জ্যোতিষশাস্ত্রে ভবিষ্যৎ ঘটনা [এবং ব্যাক্তিবিশেষের আগাম ভবিষ্যৎ] সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়সমূহ এবং এর পূর্বাভাসগুলি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে দেখা গেছে এই পূর্বাভাসগুলো সঠিক নয় এবং জ্যোতিষের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

১.৭ বেশির ভাগ প্রাচীন সভ্যতায় পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র বলে বিশ্বাস করা হত।

অধিকাংশ প্রাচীন সমাজের অধিবাসীরা, ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আশেপাশে জীবিত গুটিকয়েক গ্রিক জ্যোতির্বিদ ছাড়া, সবাই বিশ্বাস করত যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করে। ষোড়শ শতাব্দীর কোপার্নিকান বিপ্লবের আগ পর্যন্ত দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় জুড়ে ইউরোপ ও এশিয়ার সমাজে এই ভুকেন্দ্রিক মতবাদই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট কেন্দ্র বলে কিছু খুঁজে পাননি।

১.৮ একশো বছরের প্রচেষ্টায় কোপার্নিকান বিপ্লব সৌরজগতের কেন্দ্রে পৃথিবীর বদলে সূর্যকে প্রতিস্থাপন করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস তাঁর সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রকাশ করলেন। এই মত অনুযায়ী জগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এখন অবশ্য আমরা জানি যে, সূর্য সমস্ত জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নয় বরঞ্চ শুধু সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। তবে ঐ সময়ে কোপার্নিকান সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছিল এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।

১.৯ প্রায় চারশত বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম প্রণালীবদ্ধ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন।

নিজে টেলিস্কোপ আবিষ্কার না করলেও গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম এটা দিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি প্রতিসারক দুরবিনের উন্নতি সাধন করলেন এবং ফলে তিনি শুক্রগ্রহের দশা পরিবর্তন এবং বৃহস্পতি গ্রহের চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই চারটিকে আজও গ্যালিলিয়ান চাঁদ বলে। তাঁর এইসব আবিষ্কারের ফলে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের সপক্ষে জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে।

১.১০ পৃথিবী নামক গ্রহটির আকৃতি প্রায় বর্তুল আকৃতির এবং বহু শতাব্দী ধরে তা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত ছিল।

অনেক প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৃথিবীকে সমতল বা চাকতির মতো ভেবে নিয়ে তাদের বিশ্ববীক্ষা দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীকে গোলক হিসেবে ভাবনাও কয়েক হাজার বছরের পুরনো এবং অন্য অনেক সভ্যতা ও সমাজের বিশ্ববীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রচলিত ছিল। প্রায় ১০০০ বছর আগে এই ধারণাই প্রভাবশালী প্যারাডাইম হিসেবে গৃহীত হয়। পৃথিবী যে প্রায় গোলাকাকৃতির (বৈজ্ঞানিক ভাষায় অবলেট স্ফেরয়েড, পেটমোটা কমলালেবু) সেটা পরীক্ষা করে দেখার অনেকগুলো এমপিরিক্যাল উপায় আছে। এরাটোস্থেনিস একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন যা প্রাচীনতম গাণিতিক পদ্ধতিগুলির অন্যতম। তিনি প্রাচীন মিশরের দুটি স্থানে পরিমাপিত লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন (খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী)।

২ অনেক মহাজাগতিক ঘটনাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ।

আলাস্কার বনাঞ্চলে অরোরা বোরিয়ালিসের আলোর খেলা - রাতের আকাশের বিস্ময়

ছবি সৌজন্যে - Jean Beaufort (Public Domain Pictures)

২.১ পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে বলে আমরা দিন ও রাতের পার্থক্য বুঝতে পারি।

পৃথিবীর যে পার্শ্বটি সূর্যের দিকে পাশ ফিরে থাকে সেখানে দিন হয় এবং অপরপাশে রাত হয়। নিজ অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর যে সময়টুকু প্রয়োজন হয়, যাতে করে সূর্য আকাশের ঠিক একই স্থানে ফিরে আসে, সেটা গড়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা এবং একে (সৌর) দিন বলে।

২.২ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী এক বছরে একবার ঘুরে আসে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের আনতির কারণে আমরা ঋতুর পার্থক্য বুঝতে পারি।

সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষীয় তলের উপর কল্পিত উলম্ব রেখার সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ ২৩.৪° হেলে থাকে। এই কারণে, সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ অথবা দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে এবং অন্য গোলার্ধটি বিপরীত দিকে হেলে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে গ্রীষ্মকাল সংঘটিত হয়-- কারণ সূর্যরশ্মি অনেকটা খাড়াভাবে ভূপৃষ্ঠে পড়ে, তাছাড়া আকাশে সূর্যের উচ্চতাও বাড়ে, ফলে দিনের দৈর্ঘ্যও বেশি হয়। অন্যপক্ষে, যে গোলার্ধটি সূর্যের বিপরীত দিকে হেলে থাকে, সেখানে সূর্যরশ্মি অনেকটা আনত কোণে ভূপৃষ্ঠে পড়ে বলে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে যায়। সেখানে তখন শীতকাল হয়। দিনও ছোট হয়ে আসে কেননা আকাশে সূর্যের উচ্চতাও কম হয়।

২.৩ আমরা চন্দ্রচক্র জুড়ে চাঁদের বিভিন্ন দশা দেখতে পাই।

পৃথিবীকে আবর্তনকালে, সূর্য এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে , চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান প্রতিনিয়ত বদলায়। চন্দ্রপৃষ্ঠের যে অংশটিতে সূর্যালোক পড়ে সেটিও বদলায়। এজন্যই পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের কলা পরিবর্তন দেখি-- অমাবস্যা, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাদি। এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমার সময় লাগে ২৯.৫৩ দিন। পৃথিবীর সকল দর্শকের জন্যই চন্দ্রকলা যদিও (মোটামুটি) একই রকম দেখায়, গোলার্ধ সাপেক্ষে চাঁদের অবস্থান ভিন্ন হবে শুধু। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দর্শক হয়ত দেখলেন চন্দ্রকলা (হেলাল) চাঁদের বাঁয়ে খুলছে, অন্য এক দর্শক অন্য জায়গা থেকে হয়ত দেখবেন চন্দ্রকলা (হেলাল বা ক্রিসেন্ট) চাঁদের ডানে খুলছে-- উভয়ই যদিও একই দশাই দেখছেন।

২.৪ পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের বিশেষ অবস্থানের কারণে গ্রহণ সংঘটিত হয়।

চলার পথে চাঁদ মাঝে মাঝে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, তখন চাঁদ সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয় এবং ফলত পৃথিবীতে এর ছায়া পড়ে। এটাই সূর্যগ্রহণ। কখনও কখনও পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের ঠিক মাঝ বরাবর উপস্থিত হয়। তখন চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে, ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠ ঢাকা পড়ে যায় এবং চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। গ্রহণ আংশিক হতে পারে, যখন বস্তুটির অংশবিশেষ ঢাকা পড়ে, কিংবা পূর্ণ হতে পারে যখন বস্তুটির সম্পূর্ণ অংশ আবরিত বা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমাতেই সংঘটিত হয় বলেই একে শুধু রাতেই দেখা যায়। পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণের চেয়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখার সম্ভাবনাই বেশি। চন্দ্রগ্রহণের স্থায়িত্বও দীর্ঘক্ষণ হয়, সূর্যগ্রহণের তুলনায়।

২.৫ সূর্য ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ জনিত আকর্ষণের কারণে পৃথিবীতে জোয়ারভাটা হয়।

পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটার মূল কারণ চাঁদ, এবং কিছুটা সূর্য। পৃথিবীতে, বিশেষ করে এর সমুদ্রভাগে, স্ফীতি দেখা দেয়। এই স্ফীতি চাঁদের এবং সূর্যের নিকটতম পার্শ্বে, এবং এদের উল্টোদিকেও ঘটে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এই স্ফীতি সমুদ্রতীরবর্তী তটরেখায় জলের উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। যখন চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবী এক সরলরেখায় আসে (অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়) তখন শক্তিশালী জোয়ার হয়। একে বলে তেজ কটাল বা ভরা জোয়ার। আবার চাঁদ ও সূর্য যখন পৃথিবীর সাপেক্ষে সমকোণে অবস্থান করে (অষ্টমী তিথিতে, চাঁদের প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্থাংশে) তখন দুর্বল জোয়ার হয়। একে মরা কটাল বলে।

২.৬ পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের জন্য সূর্যের আলো অপরিহার্য।

পৃথিবীতে সকল জীবের ব্যবহৃত শক্তির প্রাথমিক উৎস হল সূর্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উদ্ভিদ সূর্যালোককে ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যা তাদের বৃদ্ধিরও সহায়ক বটে। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আণবিক অক্সিজেন তৈরি হয়। ঐ অক্সিজেন ব্যবহার করে প্রাণীজগৎ তাদের শ্বসনকার্য চালায়। এমন মনে করা হয় যে, একটি গ্রহাণুর সাথে সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর বৈশ্বিক পরিবেশের অপূরণীয় ধ্বংস সাধিত হয়। যার কারণে সকল উড়ান-অক্ষম ডাইনোসর এবং পৃথিবীর অধিকাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ফলে এক সুবিপুল ধূলারাশি পৃথিবীর বাতাবরণে ছড়িয়ে গিয়ে সূর্যালোক ঢেকে দিয়েছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী ‘ইমপ্যাক্ট-উইন্টার’ সৃষ্টি করেছিল। সূর্যরশ্মি আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে। রোদের কারণে আমাদের চামড়ায় ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। এটা আমাদের শরীরের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো গবেষণায় এটা দেখা গেছে যে, সূর্যালোক কম দেখার সাথে মানসিক বিষন্নতার সম্পর্ক আছে।

২.৭ পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন কণার কারণে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়।

সোলার-ইরাপশন বা সৌরোৎপাতের সময়ে প্রচুর আহিত কণা (মূলত ইলেকট্রন ও প্রোটন) নির্গত হয় যা সূর্য থেকে ১৫ কোটি কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে এরা বাধা পড়ে, চৌম্বক মেরুদ্বয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং ঊর্ধ্বাকাশের কণার সাথে এদের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। উচ্চগতিসম্পন্ন হলে এসব কণা সূর্য থেকে আধাঘন্টায় পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। নিম্নগতিসম্পন্ন কণার পৌঁছতে পাঁচদিন লাগতে পারে। মাঝে মাঝে এই চার্জযুক্ত কণাদের ঝড় পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে বিস্রস্ত করে, স্যাটেলাইট নষ্ট করে এবং বৈদ্যুতিক গ্রিডের ক্ষতিসাধন করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সাথে এই কণাদের প্রায়শই মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়াই মেরুপ্রভার সৃষ্টি করে। মেরুপ্রভার ফলে উত্তর চৌম্বক মেরু ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরু অঞ্চলের রাতের আকাশে অপার্থিব আলোকচ্ছটার সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে এটা অরোরা বরিয়ালিস এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এটি অরোরা অস্ট্রালিস নামে পরিচিত।

২.৮ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও অংশ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ডেটা পর্যালোচনার জন্য ব্যবহৃত বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্র ও পদ্ধতি ইন্ডাস্ট্রিতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং আমাদের নৈমিত্তিক ব্যবহার্য প্রযুক্তিতেও প্রয়োগ করা হয়। মুঠোফোনের ডিজিটাল ক্যামেরার মতো ডিভাইসে যেসব ডিটেক্টর ব্যবহৃত হয় তাদের উৎপত্তি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার কাজে। অ্যাসট্রনমিক্যাল টেলিস্কোপে ব্যবহারের জন্য যেসব বিশেষ কাঁচ উদ্ভাবিত হয়েছে, সেসবই আজকাল LCD স্ক্রিন, কম্পিউটার চিপ, সেরামিক স্টোভ-টপের মতো প্রযুক্তিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাঝে যে নলেজ-ট্রান্সফার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনিময় ঘটেছে, তার সাহায্যে আমরা ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI) ও কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফির (CAT স্ক্যানার) মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছি।

৩ রাতের আকাশ বিচিত্র, সমৃদ্ধ এবং গতিময়।

আন্দেজ পর্বতমালার চিলির অংশে তোলা লং-এক্সপোজার আলোকচিত্র - এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট নক্ষত্রের আলোর রেখা

ছবি সৌজন্যে - S. Otarola/ESO

৩.১ অন্ধকার মেঘমুক্ত রাতের আকাশে আমরা কয়েক হাজার তারা খালি চোখে দেখতে পাই।

শহুরে আলোর দূষণ থেকে দূরে কোথাও কোনো এক অমাবস্যার রাতের অথবা চাঁদমুক্ত আকাশে খালি চোখে তাকালে প্রায় ৪০০০ তারা দেখা যায়। খালি চোখে দেখা সকল তারাই আমাদের ছায়াপথের অংশ। যদিও অন্যান্য গ্যালাক্সিতেও কোটি কোটি তারা থাকে, এবং এই দৃশ্যমান মহাবিশ্বে ট্রিলিয়ন সংখ্যক গ্যালাক্সি আছে, কিন্তু ঐসব নক্ষত্র আমাদের থেকে এতো বেশি দূরে এবং সেহেতু এতো ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্যের যে আমাদের চোখে তাদেরকে একক আলোর উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়না। এছাড়াও পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে এবং পর্যবেক্ষণের সময়ের উপর নির্ভর করে আরো কিছু জ্যোতিষ্ক খালি চোখে দেখা যায়। যেমন- সৌরজগতের পাঁচটি উজ্জ্বলতম গ্রহ, আকাশগঙ্গা ছায়াপথের ব্যান্ড, আকাশগঙ্গার দুটো উপ-গ্যালাক্সি (লার্জ ও স্মল ম্যাজেলানিক ক্লাউড) এবং অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি (একটা বৃহৎ কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি)।

৩.২ রাতের আকাশ দেখে পৃথিবীতে নিজের অবস্থান জানা যায় [অরিয়েন্টেশন, দিক-সচেতনতা] এবং যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা [নেভিগেশন] পাওয়া যায়।

রাতের আকাশ দেখে আমরা মৌলিক দিকগুলির হদিস পাই। যেমন উত্তর গোলার্ধে উত্তর দিক চেনার সহজ উপায় হলো ধ্রুবতারা চিহ্নিত করা। এটি নর্থ স্টার বা পোলারিস নামেও পরিচিত যা খ-উত্তর মেরুর খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ধ্রুবতারা খুঁজে পাবার সহজ পদ্ধতি হলো আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং লঘু সপ্তর্ষি-- এ দুটো তারামণ্ডলী খুঁজে বের করা। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ খ-মেরুর কাছাকাছি সিগমা অক্টান্টিস তারাটি অনুজ্জ্বল হওয়ায় একে সহজে দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ দিক খুঁজে পাবার একটি সহজ উপায় হলো ত্রিশঙ্কু মণ্ডলী (ক্রাক্স) এবং মহিষাসুর মণ্ডলীর (সেন্টরাস) দুটি উজ্জ্বলতম তারাকে ব্যবহার করা।

৩.৩ কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের দোলাচল ঘটে (অয়নচলন)।

পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তনরত লাটিমের মতো ঘোরে। এই ঘূর্ণন-অক্ষের দিকটি ধীর অগ্রগমনে প্রায় ২৬,০০০ বছর পর পর পরিবর্তিত হয়। এই চলনের ফলে ঘূর্ণনাক্ষটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে। ফলশ্রুতিতে উত্তর ও দক্ষিণ খ-মেরুও সময়ের সাথে ধীরগতিতে অবস্থান পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ধ্রুবতারা (পোলারিস) তার অবস্থান থেকে এক সময়ে সরে যাবে এবং তখন, সেইসময়কার পৃথিবীর অক্ষের দিকের সাপেক্ষে, অন্য কোনো তারা হয়ত ধ্রুবতারার জায়গা নেবে। বর্তমানে দক্ষিণ খ-মেরু নির্দেশকারী কোনো উজ্জ্বল তারা না থাকলেও ভবিষ্যতে আমরা একটি প্রকৃত 'দক্ষিণের ধ্রুবতারা' বা 'সাউথ স্টার' পাবো।

৩.৪ সূর্য দিগন্তের উপরে থাকলে খালি চোখে মাত্র গুটিকয়েক জোতিষ্ক দেখা যায়।

সূর্যের উজ্জ্বল আলোর তুলনায় রাতের আকাশের অধিকাংশ জ্যোতিষ্ক এতো অনুজ্জ্বল যে, দিনের বেলা তাদের দেখাই যায় না। আলোকদূষণের ফলে রাতের বেলাতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম আলোর নিয়ন্ত্রণহীন আলোকচ্ছটায় রাতের আকাশ স্বাভাবিকের তুলনায় এতো উজ্জ্বল থাকে যে আমরা শুধু অল্প কিছু তারাই কেবল দেখতে পারি। সূর্য দিগন্তের ওপর থাকা অবস্থায় মাত্র গুটিকয়েক জ্যোতিষ্কই দেখা যায় যাদের কিছুটা উজ্জ্বলতা রয়েছে। যেমন, দিনের বেলায় চাঁদ দেখা যেতে পঅরে (নির্ভর করে সে কোন দশায় আছে)। এছাড়া কখনও কখনও খুব সকালে 'শুকতারা' ও সন্ধ্যাবেলায় 'সন্ধ্যাতারা' (শুক্রগ্রহ) দেখা যায়। দুপুরের আকাশেও শুক্রগ্রহকে দেখা সম্ভব, যদি আগে থেকেই জানা থাকে কোথায় দেখতে পাবার কথা। দিনের বেলায় কালেভদ্রে কোনো কোনো ধূমকেতু দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়, যদি সেটা খুবই উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

৩.৫ পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে জ্যোতিষ্কগুলো (গ্রহ/নক্ষত্র) পুবাকাশে উঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

পশ্চিম থেকে পুবে নিজ অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ভূপৃষ্ঠের একজন দর্শকের কাছে মনে হয়, পুরো আকাশটাই উল্টোদিকে, অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে, ঘুরছে। পৃথিবীর চারিদিকে আকাশের এই দৃশ্যত আপাতচলনকে আহ্নিক গতি বলে। এই কারণে জ্যোতিষ্কদেরকে আমরা পূর্ব দিগন্তে উদিত হতে দেখি এবং পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যেতে দেখি।

৩.৬ তারার মিটমিট করে জ্বলার কারণ হল আমাদের বায়ুমণ্ডল।

দূরান্তের নক্ষত্রের আলো আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গমন করে। ঐ স্তরগুলোর একেকটির তাপমাত্রা ও ঘনত্ব একেক রকম থাকে বিধায় প্রতিসরণও একেক রকম হয়, ফলে আলোর দিকও ক্ষণেক্ষণে বদলে যায়। এর ফলে তারার আলোর উজ্জ্বলতা এবং যেদিক থেকে এটি পৃথিবীতে পৌঁছে তাও ক্ষণে ক্ষণে বদলাতে থাকে। এই কারণে পৃথিবীস্থ একজন দর্শকের কাছে মনে হয় যেন দূরবর্তী নক্ষত্রকে 'মিটমিট' করছে। গ্রহদের ক্ষেত্রে, অবশ্য এই ব্যাপারটা প্রায় বোঝাই যায়না। এর কারণ এইজন্য যে গ্রহদেরকে প্রায় চাকতির মতোই দেখায় (বাইনোকুলারে দেখলে সহজেই ডিস্ক বোঝা যায়)। কিন্তু নক্ষত্রেরা আমাদের কাছে বিন্দুবৎ আলোর উৎস বলেই মনে হয়, আর যেহেতু এর পুরোটা আলোই একটি উৎস বিন্দু থেকে আসে, তাই প্রতিসরণের কারণে দিকবিভ্রম হয়।

৩.৭ প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন উল্কাপিন্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

উল্কাণু (মিটিওরয়েড) হলো একরকম ছোট পাথুরে বা ধাতব বস্তু যাদের আকৃতি বালির কণার থেকে শুরু করে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রবেশ করে এবং ফলত 'র‍্যাম প্রেশারে' [প্রবিষ্ট বস্তুর সামনের অংশের বাতাস সাংঘাতিক সংকুচিত হয়ে যায়, এভাবে সুপারসনিক শকওয়েভের সৃষ্টি হয়, এই আচানক সংকোচনে বাতাস গরম হয়ে ওঠে, এরাই প্রবিষ্ট বস্তুকে উত্তপ্ত করে তোলে, ঘর্ষণ নয়] উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন রাতের আকাশে আলোর ঝলকানি সৃষ্টি হয়। এটাই উল্কাপাত বা 'তারা খসে পড়া'। এই উল্কাণুখণ্ড যদি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তখন তাকে উল্কাপিণ্ড বলে। তবে ব্যাপার হলো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন উল্কাপাত হলেও বেশিরভাগই মাটিতে পৌঁছানোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গ্যাস ও ধূলিকণা তৈরি করে।

৪

জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন জোতিষ্ক এবং মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে।

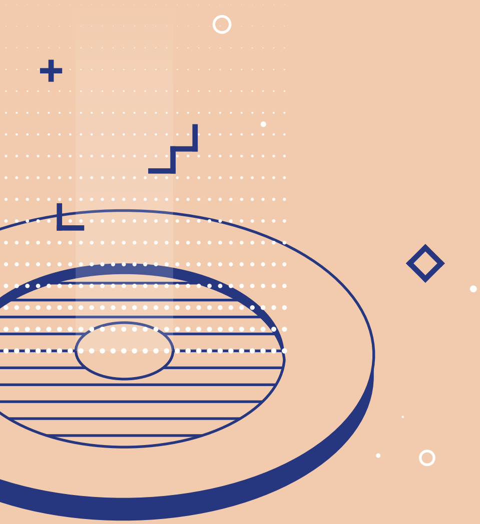

চিত্রকরের কল্পনায় দুটি জোড়া নিউট্রন তারা পরস্পরের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এগুচ্ছে এবং মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিকিরণ করছে।

ছবি সৌজন্যে - R. Hurt/Caltech-JPL

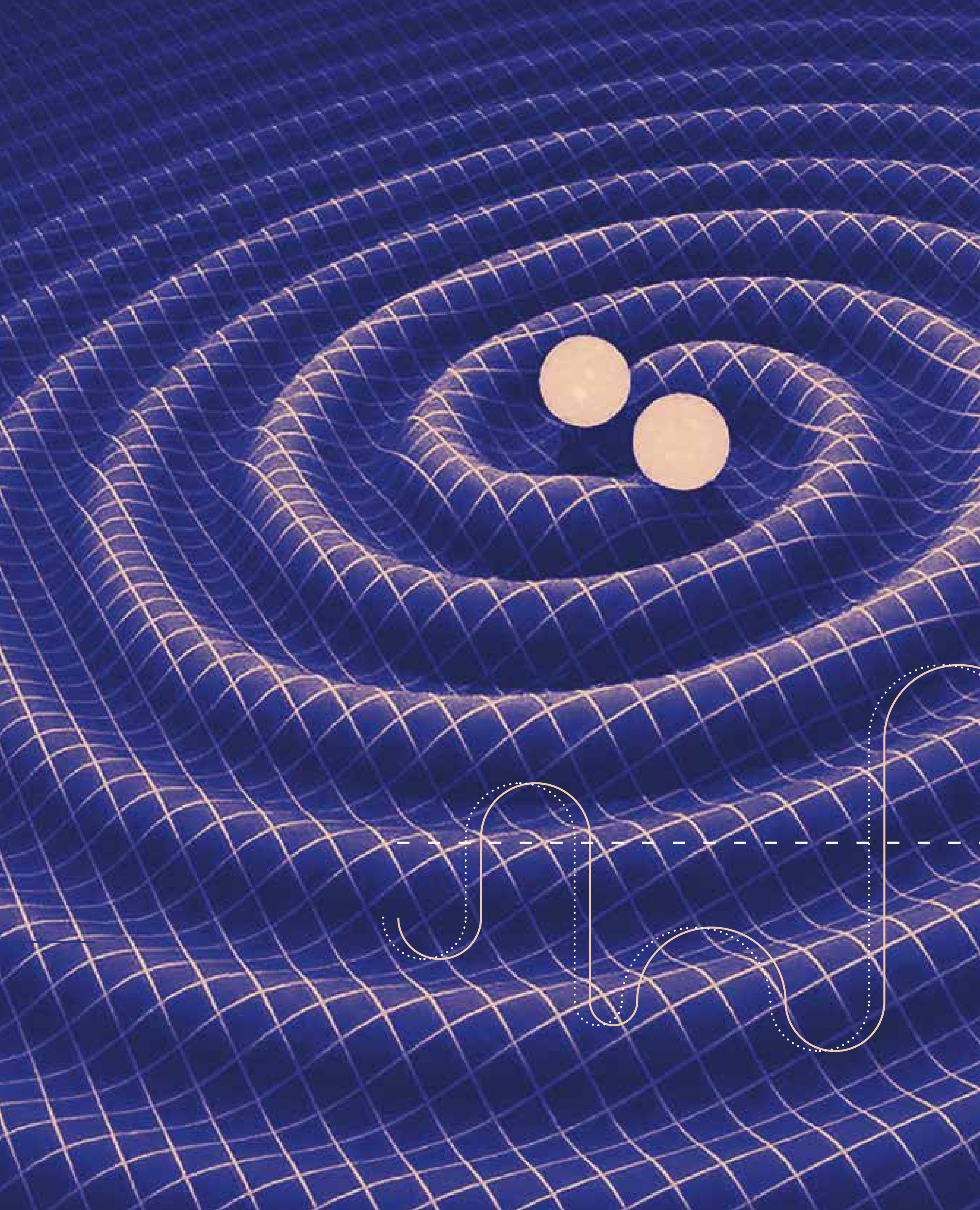

৪.১ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রধান উৎস আলো যা একপ্রকার বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ।

অধিকাংশ মহাজাগতিক বস্তু আমাদের থেকে এতো দূরে অবস্থিত যে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে ঐ সব বস্তুর বিকিরিত বিদ্যুৎচুম্বক বিকিরণই (আলো) আমাদের ভরসাস্থল। বিদ্যুৎচুম্বক বর্ণালির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমরা বিভিন্ন তথ্য পেতে পারি যা ঐ মহাজাগতিক বস্তুর প্রকৃতি এবং নানা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চের ব্যাপারে আলোকপাত করে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অনুধাবনে বিদ্যুৎচুম্বক বর্ণালির পুরোটাই কাজে লাগানো হয়-- যেমন বেতার, মাইক্রো-ওয়েভ, অবলোহিত, দৃশ্যমান, অতিবেগুনি, এক্স-রে এবং গামারশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সাধারণ কথাবার্তায় 'আলো' বলতে শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো বোঝালেও জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'আলো' বলতে বিদ্যুৎচুম্বক বর্ণালি বোঝায়।

৪.২ বৃহৎ পরিসরে মহাকর্ষ হলো মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিথস্ক্রিয়া।

মহাজাগতিক বস্তুগুলো সাধারণত চার্জ নিরপেক্ষ হয়। কাজেই বিশাল দুরত্বে থেকেও এদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটার প্রধান দস্তুর হলো মহাকর্ষ। সূর্যের চারদিকে গ্রহদেরকে ঘূর্ণ্যমান রাখা, গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারদিকে নক্ষত্রমালাকে ঘূর্ণ্যমান রাখা এবং নক্ষত্রের উত্তপ্ত প্লাজমাকে গোলকে ধরে রাখার প্রধান কৃতিত্ব মহাকর্ষের। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেশিরভাগ প্রপঞ্চকেই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে খুব ব্যতিক্রমী অবস্থাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে দরকার হয় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের।

৪.৩ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এবং অবপারমাণবিক কণা এই মহাবিশ্বকে বোঝার নয়া তরিকা দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব মহাকর্ষীয় তরঙ্গের তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যাকে মূলত স্থান-কালের ঢেউ বলে প্রতীয়মান করা চলে। কিন্ত এদের নিশ্চিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে ২০১৫ সালে। আজকাল মহাবিশ্ব অনুধাবনের জন্য এটা বিজ্ঞানীদের জন্য একটি নতুন জানালা খুলে দিয়েছে। দুটো ভারী কৃষ্ণবিবর কিংবা দুটো নিউট্রন তারার একীভবনের মতো ভয়ানক শক্তিশালী মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়ার ফলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরি হতে পারে। এছাড়া নিউট্রিনো, ইলেকট্রন বা প্রোটনের মতো নানারকম অবপারমাণবিক কণা ডিটেক্ট করে সূর্যের অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যবিধ শক্তিশালী প্রপঞ্চের বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন।

৪.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক তাত্ত্বিক অবকাঠামোতে বিবিধ [আকাশ] পর্যবেক্ষণ এবং কম্পিউটার সিমুলেশন থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ব্যবহার করে নানাবিধ মহাজাগতিক ঘটনার মডেল নির্মাণ করা হয়।

মহাজাগতিক বস্তুসমূহ, তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রপঞ্চ এবং তাদের বিবর্তন সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গাণিতিক মডেল নির্মাণ করে থাকেন। এইসব গাণিতিক মডেলের তত্ত্বীয় কাঠামো পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়। কোনো কোনো মডেলে একদম প্রাথমিক গাণিতিক সম্পর্ক ব্যবহার করা হয়, আবার জটিলতর মডেলও আছে যেখানে নিউমেরিকাল সিমুলেশন ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল সিমুলেশনগুলো চালাতে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারগুলোকে কাজে লাগানো হয়। এইসব মডেলের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে এবং আরও নিখুঁত করতে বিভিন্ন টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টরের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ডেটা ব্যবহার করা হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মডেল ও পর্যবেক্ষণসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণের পারস্পরিক বোঝাপড়া।

৪.৫ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে আহৃত জ্ঞান ব্যবহার করা হয়। যেমন: পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে পেশাগত গবেষণায় গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রকৌশলশাস্ত্র, কম্পিউটার সায়েন্স এবং বিদ্যাচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্মিলিত জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়। মহাকাশের জ্যোতিষ্ক এবং মহাজাগতিক প্রপঞ্চ জানা, বোঝা এবং মডেল করার জন্য এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যে নিউক্লীয় বা কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া চলে তা বোঝার জন্য নিউক্লিয়ার ফিজিকস প্রয়োজন; এই বিক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রের বাতাবরণে কী ধরনের মৌল পাওয়া যেতে পারে তা নিরূপণের জন্য প্রয়োজন রসায়নের। ওদিকে বড় ও কেতাদুরস্ত টেলিস্কোপ তৈরিতে দরকার প্রকৌশলবিদ্যার এবং এসব যন্ত্রপাতি থেকে যে ডেটা আসবে তা প্রক্রিয়া করতে এবং বিশ্লেষণ করতে প্রয়োজন কাস্টম (বিশেষ) সফটওয়্যার।

৪.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিশেষায়িত শাখা আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে বিবরণের জন্য যেহেতু বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেরও দরকার পড়ে, সেহেতু প্রধান অধীতব্য বিষয় অনুযায়ী আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও কিছু বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। এরকম কয়েকটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র হলো- জ্যোতির্জীববিজ্ঞান (অ্যাস্ট্রবায়োলজি), সৃষ্টিতত্ত্ব (কসমোলজি), পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান (অবজার্ভেশনাল অ্যাস্ট্রনমি), অ্যাস্ট্রকেমিস্ট্রি, ও গ্রহগত বিজ্ঞান (প্লানেটরি সায়েন্স)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরতর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানও অর্জন করেন, যেমন সাদা বামন তারা বিষয়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্ব সর্বাধিক ব্যাপক ও গভীর উভয়ই, সেহেতু 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' (অ্যাস্ট্রনমি) এবং 'জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান' (অ্যাস্ট্রফিজিক্স) শব্দদ্বয় আজকাল প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে।

৪.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞানে সময় ও দূরত্বের যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত স্কেল থেকে অনেক বড়।

চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক যার দুরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দুরত্বে (এই দুরত্ব জ্যোতির্বিদ্যার একক, AU নামে পরিচিত) অবস্থিত পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র হলো সূর্য যার ব্যাস প্রায় ১৩.৯ লক্ষ কিলোমিটার, ভর প্রায় ১৯৮৯ হাজার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (১৯৯ কোটি কোটি কোটি কোটি) কিলোগ্রাম। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরির দূরত্ব প্রায় ৪.২৫ আলোকবর্ষ। এক আলোকবর্ষ হলো দূরত্বের একক--- যতটুকু দুরত্ব আলো শূন্য মাধ্যমে এক বছরে অতিক্রম করে-- ৯ ট্রিলিয়ন কিলোমিটারের সামান্য বেশি। আমাদের ছায়াপথের ব্যাস প্রায় ১,০০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ আলোকবর্ষ এবং অন্যান্য গ্যালাক্সির দুরত্ব কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ হতে পারে। এজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এককগুলি আমাদের দৈনন্দিন কল্পনার চাইতেও অনেক বড় হয়। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানে সময়ের পরিসরও খুব বড়-- মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছরের কথা হামেশাই ব্যবহৃত হয়।

৪.৮ বর্ণালিমিতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা এই মহাবিশ্বকে দূর থেকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে।

মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তাদের বর্ণালিতে ধরা পড়ে। বর্ণালিতে তাদের আলো রঙধনুর মতো বিবিধ রঙে ভেঙ্গে যায় এবং প্রতিটি রঙের থাকে আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এইভাবে সমাগত আলোর নানা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের মৌল গঠন, তাপমাত্রা, চাপ, চৌম্বকক্ষেত্র, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারে।

> জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ঋদ্ধ হয় এবং তাকে ত্বরান্বিত করে।

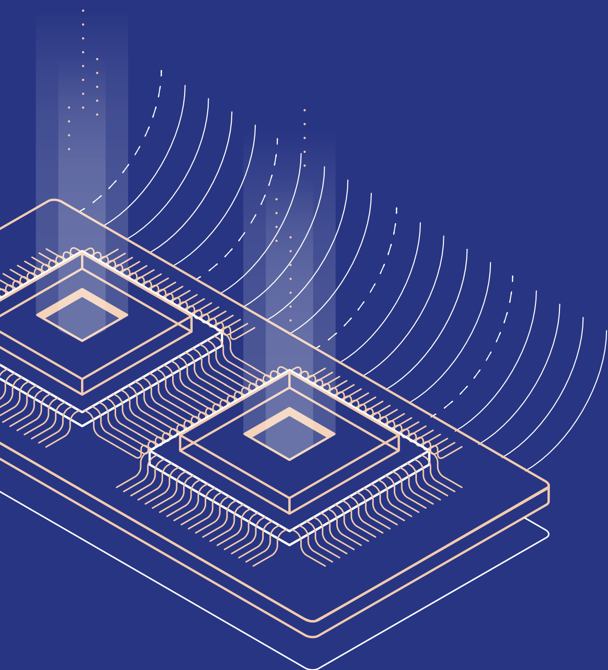

আন্দেজ পর্বতমালার চিলি অংশে স্থাপিত ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের চারটি ৮-মিটার শ্রেণির টেলিস্কোপের একটি জোড়া

ছবি সৌজন্যে - ESO/P. Horálek

৫.১ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য টেলিস্কোপ এবং ডিটেক্টর অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তথ্যের মূল উৎস বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিধায় এইসব তরঙ্গ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টরের প্রয়োজন। বৃহদাকৃতির টেলিস্কোপে বেশি আলো সংগ্রহ করা যায় বলে অনেক ক্ষীণ বস্তুও চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। বৃহদাকৃতির টেলিস্কোপের বিশ্লেষণী ক্ষমতাও বেশি থাকে বলে অভিলক্ষ্য বস্তুর অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার ধরা সহজ হয়। পূর্বকালে টেলিস্কোপের ভেতর তাকিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হতো, তবে আজকাল অত্যাধুনিক ডিটেক্টরে একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সফল পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন।

৫.২ কোনো কোনো টেলিস্কোপকে একত্রে সংযুক্ত করে একটি বড় টেলিস্কোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ইন্টারফেরোমেট্রি পদ্ধতির মাধ্যমে অনেকগুলো পৃথক টেলিস্কোপকে সংযুক্ত করে একটি বড় একক টেলিস্কোপ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এভাবে যে রেজোলুশন বা বিশ্লেষণী ক্ষমতা পাওয়া যায় সেটা এমন একটি একক টেলিস্কোপের রেজোলুশনের সমতুল্য হয়,যার ব্যাস সংযুক্ত ছোট টেলিস্কোপগুলির যে দুটির মধ্যে ব্যবধান বৃহত্তম, সেই দূরত্বের সমান হয়। এভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক বস্তুর অনেক খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম তথ্য দেখতে পারেন এবং পরস্পর বিযুক্ত বস্তুদেরকেও আলাদা করে দেখতে পারেন, যেমন একটি নক্ষত্র ও এর গ্রহ-সিস্টেমকে আলাদা করা সম্ভব হয়।

৫.৩ পৃথিবী এবং মহাশূণ্যের বিভিন্ন জায়গায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দির রয়েছে।

বিদ্যুৎচুম্বক বর্ণালির বেশিরভাগটাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শোষণ করে নেয়। আমাদের বায়ুমণ্ডল দৃশ্যমান আলো, কিছু অতিবেগুনি ও অবলোহিত আলো, এবং শর্টওয়েভ রেডিও ছাড়া আর [কিছুই যেতে দেয় না] সবার জন্য অনচ্ছ। বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মির ব্যান্ড, অবলোহিত আলোর একটা বড় পরিসর, রঞ্জনরশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে পারে না। সেইজন্য দৃশ্যমান আলো, রেডিও এবং অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্বল্প কিছু ব্যান্ড দেখে এমন টেলিস্কোপ ছাড়া অন্য সবগুলিকেই মহাশূন্যে স্থাপন করতে হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে দৃশ্যমান আলো নির্বিঘ্নে দেখা গেলেও বায়ুমণ্ডলের নানান অস্থিরতায় প্রতিদিনের গুণগত মান খুব খারাপ হতে পারে। এইজন্য কিছু অপটিকাল টেলিস্কোপকেও মহাশূন্যে স্থাপন করা হয়।

৫.৪ পৃথিবীস্থ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্ত ও নির্জন অঞ্চলে অবস্থিত।

অত্যুচ্চ স্থান থেকে পর্যবেক্ষণের সুবিধা, আলোক দূষণের অনুপস্থিতি, কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা-- এ ধরনের আদর্শ স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এধরনের লোকেশন প্রায়শই দুর্গম হয়, বিপজ্জনকও হতে পারে, এবং অবশ্যই বৃহৎ জনবসতি থেকে বেশ দূরেই হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কখনও কখনও এসব দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করেন পর্যবেক্ষণের জন্য, কিংবা স্থানীয় দক্ষ অপারেটরদের সহায়তায় টেলিস্কোপ চালিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে দেন অথবা রোবটিক টেলিস্কোপের সহায়তায় দূর-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেন।

৫.৫ বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান „বিগ সায়েন্স“ ও „বিগ ডেটা“র অংশ!

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন আকাশ জরিপের ফলে সুপ্রচুর ডেটা তৈরি হয়েছে, এবং ভবিষ্যত এই ডেটার পরিমাণ আরো বাড়বে। এই প্রক্রিয়ার নাম 'বিগ ডেটা অ্যাস্ট্রনমি'। এর প্রধান উদ্দেশ্য উক্ত সুপ্রচুর ডিজিটাল তথ্যের সঞ্চয়, বিশ্লেষণ ও সরবরাহ। এই কাজে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন রকমের নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পের উদ্ভব হয়েছে যার সাহায্যে মানুষের প্যাটার্ন রিকগনিশনের ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার একটা দারুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে , আধুনিক টেলিস্কোপ ও যন্ত্রপাতি বৃহদাকৃতির এবং খুব খরচবহুল হয়, তাছাড়া তাদের নির্মাণে দরকার পড়ে অনেক রকমের দক্ষতার। বিগ সায়েন্সের এই যুগে এই কাজটি সাধারণত আন্তর্জাতিক সংস্থা বা বড় কনসর্টিয়াম করে থাকে যাতে একাধিক দেশের বহু সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে।

৫.৬ জ্যোতির্বিজ্ঞানের জটিল সিমুলেশন এবং প্রচুর পরিমাণে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারের উন্নয়ন প্রয়োজন।

আধুনিক জটিল সিমুলেশন এবং পর্যবেক্ষন থেকে যে সুপ্রচুর ডেটা উৎপন্ন হয় তার প্রক্রিয়াকরণের জন্য এমন সব কম্পিউটারের দরকার হয়, যা স্বল্প সময়ে প্রচুর জটিল গণনা করতে সক্ষম। সর্বাধুনিক সুপারকম্পিউটারগুলি প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশত কোয়াড্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে সক্ষম। এইসব সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পুরো মহাবিশ্বকেই সিমুলেট করতে পারেন এবং এই গণনার সাথে বৃহৎ-পরিসরের আকাশ-জরিপের পর্যবেক্ষণ মেলাতে পারেন।

৫.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি বৈশ্বিক বিজ্ঞান যেখানে অনেক আন্তঃদেশীয় গবেষক দল কাজ করে এবং যেখানে ডেটা ও পাবলিকেশন মুক্তভাবে আদানপ্রদান করা হয়।

বেশিরভাগ পেশাদার মানমন্দিরের ডেটা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। পেশার খাতিরে একালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। বৃহদাকার টেলিস্কোপ (বা যন্ত্র) নির্মাণ থেকে শুরু করে সমন্বিত পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পেইনের মত খুব বড় আকারের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রকল্প আজকাল বিভিন্ন দেশের গবেষক ও ইনস্টিটিউটের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এখন জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈশ্বিক এবং আন্তর্জাতিক। আমরা সবাই একই আকাশের নিচে 'স্পেসশিপ আর্থ'-এর ক্রু-মেম্বার,এবং একটাই ব্রহ্মাণ্ডকে খুঁজে ফিরছি।

৫.৮ সৌরজগতকে বোঝার জন্য মহাকাশে অসংখ্য মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে।

আমরা সৌরজগতের বিভিন্ন স্থানে রোবোটিক নভোযান প্রেরণ করেছি যার প্রধান উদ্দেশ্য এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান জানা ও বোঝা। এই নভোযানগুলির মধ্যে কোনোটি গ্রহ, উপগ্রহ বা গ্রহাণুকে ঘিরে ঘুরছে, আবার কোনোটি ঐখানে ল্যান্ড করেছে। সৌর পরিবারের যেখানে যেখানে রোবোটিক বা দূর-নিয়ন্ত্রিত নভোযান ভ্রমণ করেছে (ল্যান্ডিং, অর্বিট কিংবা ফ্লাই-বাই) তার মধ্যে রয়েছে সকল গ্রহ, প্লুটো ও সেরেসের মত বামনগ্রহ, আমাদের চাঁদ, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের কিছু উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহাণু।

৬ মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার বিজ্ঞানই কসমোলোজি।

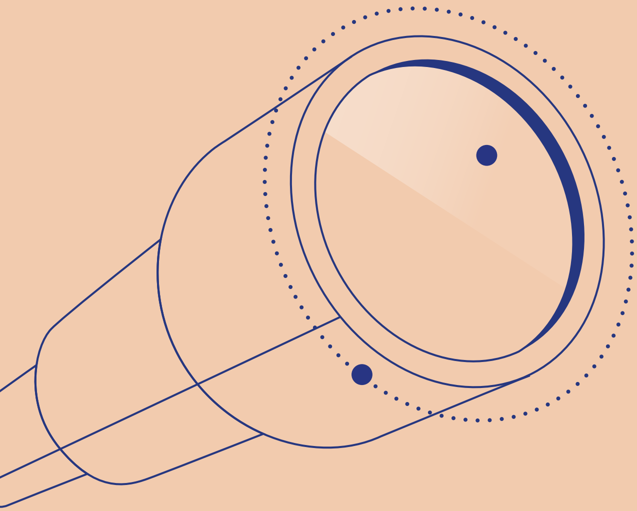

মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ - মহাবিশ্বের বয়স যখন ৩৮০০০০ বছর তখন যে বিকিরণ নির্গত হয়েছিল তার অবশেষ

ছবি সৌজন্যে – ESA and the Planck Collaboration

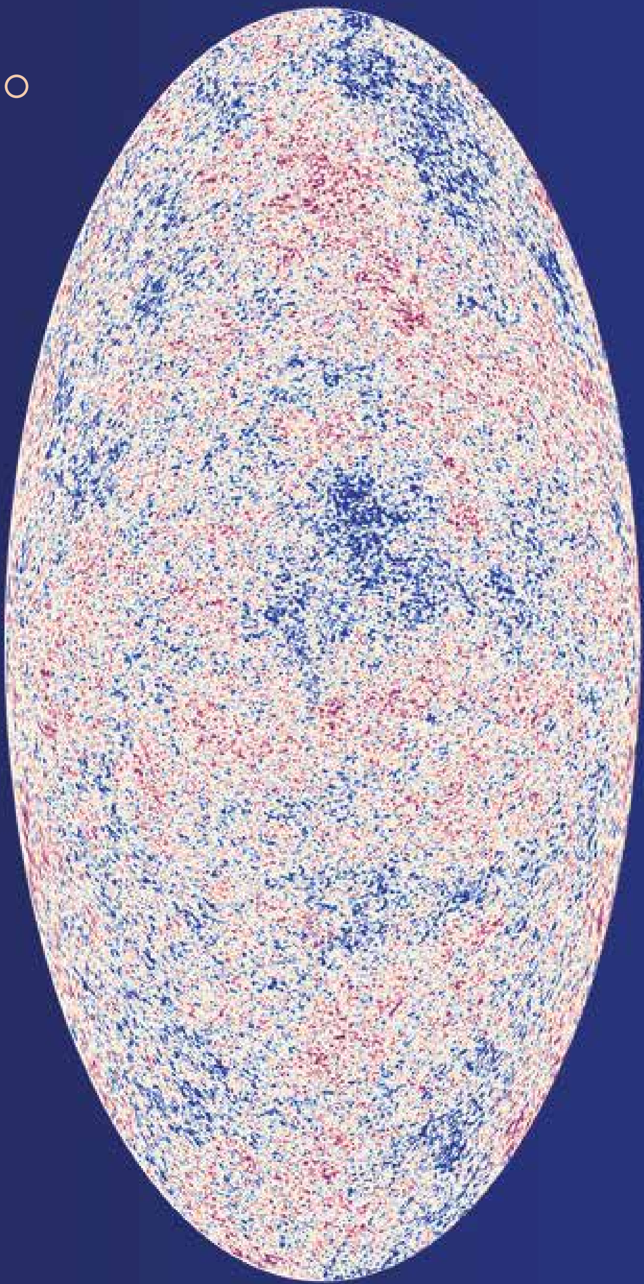

৬.১ এই মহাবিশ্বের বয়স তের'শ কোটি বছরের বেশি।

আধুনিক পর্যবেক্ষণ এবং সর্বাধুনিক কসমোলজিকাল মডেলের সাহায্যে মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ করা গিয়েছে প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর। কসমোলজি এমন এক গবেষণা ক্ষেত্র যেখানে মহাবিশ্বের গঠন, কাঠামো এবং এর বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

৬.২ মহাবিশ্ব ব্যাপক পরিসরে সমসত্ব ও দিকনিরপেক্ষ।

বৃহত্তর কাঠামোয় (৩০ কোটি আলোকবর্ষের ওধারে) মহাবিশ্বে পদার্থের বন্টন সুষম বলে মনে হয়। এইরকম প্রায় সুষম ঘনত্ব ও কাঠামোর কারণে মহাবিশ্বকে যেকোনো জায়গা থেকেই একই রকম দেখায় (সমস্বত্ব) এবং সকল দিকেই একই রকম দেখায় (দিক নিরপেক্ষ) ।

৬.৩ আমরা সর্বদা অতীত পর্যবেক্ষণ করি।

আলোর সসীম দ্রুতির কারণে আমরা সর্বদা অতীত পর্যবেক্ষণ করি। কোনো বস্তু এখন কেমন সেটা আমরা কখনোই জানতে পারি না। সূর্য থেকে আলো আসতে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে বলে আমরা সূর্যকে দেখি আট মিনিট আগেকার সূর্য হিসেবে। অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে যখন আমরা দেখি তখন সেটাও ২৫ লক্ষ বছর আগেকার ছবি, কেননা সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে অতটাই সময় প্রয়োজন। এইজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বদা অতীতই পর্যবেক্ষণ করেন, এমনকি ১৩৮০ কোটি বছর আগ পর্যন্ত। এজন্য বিভিন্ন দুরত্বের মহাজাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ করার একটি অর্থ হলো আমরা আসলে কসমিক হিস্ট্রির বিভিন্ন ক্ষণ বা পর্ব পর্যবেক্ষণ করছি। যেহেতু মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র গড়ে একই থাকে, তাই ঐ পর্ব বা প্রস্থচ্ছেদ মূলত নিজেদের ইতিহাসেরই মূল্যবান সূত্র হাতে তুলে দেয়।

৬.৪ আমরা গোটা মহাবিশ্বের শুধুমাত্র একটি খণ্ডাংশ দেখতে পাই।

মহাশূন্যে যেহেতু আলো সসীম দ্রুতিতে চলে, সেজন্য মহাবিশ্বের বহু দূরের কিছু অংশ হয়ত আমরা এখনো পর্যবেক্ষণই করতে পারিনি। এর সহজ কারণ হলো ঐসব অংশের আলো আজো পৃথিবীর ডিটেক্টরে পৌঁছতে পারেনি। এইজন্য আমরা 'দৃশ্যমান মহাবিশ্ব' যতটুকু তার মধ্যেই সবকিছু দেখতে পাই। এই অংশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পেরেছে। ঐ অংশের একদম সীমান্তবর্তী বস্তু, যা আমাদের থেকে বহু বহু দূরে, সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আগ্রহ আছে। কেননা মহাবিশ্ব যখন কেবল তৈরি হয়েছে, তখন ঐ [দুরান্তের প্রান্তস্পর্শী] বস্তুসমূহ যেমন ছিল, আমরা তাদেরকে ঐরকমই দেখব বলে।

৬.৫ মহাবিশ্ব মূলত ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দ্বারা নির্মিত।

যেসকল নক্ষত্র আমরা দেখি, যে বাতাস আমরা শ্বাস নেই, আমাদের দেহ এবং আমাদের চারপাশে যা কিছু আমরা দেখি তা সবই পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণু আবার ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। এটাই ব্যারিয়নিক পদার্থ যার সাথে আমাদের দৈনন্দিন যাবতীয় মোলাকাত হয়। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা বলতে পারি, এই ব্যারিয়নিক পদার্থের অংশ মহাবিশ্বের মোট উপাদানের মাত্র ৫%। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দেখা গেছে, এই মহাবিশ্ব প্রধানত এক অজানা প্রকৃতির শক্তি, যার নাম ডার্ক এনার্জি, দিয়ে গঠিত (প্রায় ৬৮%); এবং এক বিচিত্র প্রকৃতির পদার্থ, যার নাম ডার্ক ম্যাটার বা তমোবস্তু, দিয়ে তৈরি (প্রায় ২৭%)। এই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি নিয়ে প্রচুর সক্রিয় গবেষণা চলছে, মূলত ব্যারিয়নিক পদার্থের উপর এদের কী কী প্রভাব ফেলে তার পর্যবেক্ষণ থেকে।

৬.৬ মহাবিশ্ব ত্বরিত হারে প্রসারিত হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণমূলক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, মহাবিশ্ব ত্বরিত হারে প্রসারিত হচ্ছে, এবং সেটার কারণ ডার্ক এনার্জি। বৃহৎ স্কেলে যেহেতু মহাবিশ্ব সুসঙ্গতভাবে প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সিদের স্তবকও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আধুনিক মডেলগুলোয় দেখা যায়, গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলোর মধ্যবর্তী সকল দূরত্বই মহাজাগতিক স্কেল-ফ্যাক্টরের সাথে একই সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ডেটা দেখায় যে, একটা গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে, সেটি তত দ্রুত আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (হাবল-লেমাইটার বিধি)। অন্যান্য গ্যালাক্সির কাল্পনিক বাসিন্দারাও একই জিনিস লক্ষ করেন। তথাপি আবদ্ধ সিস্টেম (যেমন গ্যালাক্সি নিজে, বা গ্যালাক্সিদের গুচ্ছ কিংবা গ্যালাক্সি স্তবক) কসমিক প্রসারণের আওতায় পড়ে না। গ্যালাক্সিদের স্তবকে বা গুচ্ছের অভ্যন্তরে একটি গ্যালাক্সি অন্যটিকে ঘিরে ঘুরতে পারে, কিংবা একে অপরের দিকে সংঘর্ষের সম্ভাবনায় ধাবিত হতে পারে। যেমন এমনটি ঘটতে চলেছে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ও অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে।

৬.৭ মহাশূণ্যের প্রসারণের ফলে দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর রক্তিম সরণ ঘটে।

মহাজাগতিক প্রসারণ মহাবিশ্বে আলোর প্রকৃতিকে বদলে দেয়। দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোর রক্তিম সরণ হয়-- দূরত্ব যত বেশি, রক্তিম সরণও তত বেশি। এই মহাজাগতিক রক্তিম সরণ দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-- মহাজাগতিক স্কেল-ফ্যাকটরের সাথে সাথে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে কিংবা ডপলার এফেক্টের সাহায্যে। এইজন্য দূরবর্তী গ্যালাক্সিকে অবলোহিত বা রেডিও ব্যান্ডেই শুধু দেখা যায়। একই কারণে পটভূমি বিকিরণকেও প্রধানত মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে 'দেখা' যায়।

৬.৮ প্রাকৃতিক বিধিসমূহ (যেমন মহাকর্ষ) পৃথিবীতে যেমন, তেমনি মহাবিশ্বের সব জায়গায় একইভাবে কাজ করে।

পৃথিবীতে যেসব বৈজ্ঞানিক বিধি কার্যকর দেখা যায়, যেমন মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ-চুম্বকত্ব, তাপগতিবিদ্যা ইত্যাদি একইভাবে দূর মহাবিশ্বেও কার্যকর কিনা তা পরখ করে দেখা হয়েছে নানাভাবেই। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক বিধিসমূহ সারা বিশ্বেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

৬.৯ ব্যাপক পরিসরে মহাবিশ্বের কাঠামো ফিলামেন্ট, শিট এবং ভয়েড দ্বারা গঠিত।

মহাবিশ্বের বৃহৎ-স্কেলে কৃত রক্তিম-সরণ ভিত্তিক জরিপে দেখা গেছে, কয়েকশত মিলিয়ন আলোকবর্ষের স্কেলে মহাবিশ্ব ত্রিমাত্রিক স্পঞ্জ-সদৃশ-- 'সূত্র' ও 'ফাঁকা জায়গা'র সমন্বয়ে গঠিত জালের মতো। এটাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন কসমিক ওয়েব বা মহাজাগতিক জাল। সূতাকৃতির ফিলামেন্ট বা শিটে থাকে মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সি। এই ফিলামেন্টগুলি খুবই বৃহদাকৃতির হতে পারে-- দৈর্ঘ্যে কয়েকশত মিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং প্রস্থে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ। অপরদিকে এই সূতাকৃতির ফিলামেন্ট বা শিটগুলি আবার বৃহদাকৃতির শূন্য বা ফাঁকা স্থানকে বা ভয়েডকে ঘিরে জড়িয়ে থাকে। এই শূন্যস্থান বা ভয়েডগুলি কয়েক শত মিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাসের হয়ে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে গুটিকয়েক মাত্র গ্যালাক্সি থাকতে পারে।

৬.১০ অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ [কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড] আমাদেরকে আদি মহাবিশ্ব বুঝতে সাহায্য করে।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী দৃশ্যমান অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম বিদ্যুৎ-চুম্বক বিকিরণকে আমরা মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বলি। এটি ঘন এবং উত্তপ্ত আদিম মহাবিশ্বের অবশিষ্টাংশ। এতে যে তথ্যখানি 'খোদাই' করে দেওয়া হয়েছে সেটা তখনকার যখন মহাবিশ্ব ৩,৮০,০০০ বছর বয়সী ছিল। এই পটভূমি বিকিরণের সাহায্যে আমরা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে পারি। যেমন এতে কী পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার ছিল, কী পরিমাণ ডার্ক এনার্জি ছিল, মহাবিশ্বের সার্বিক জ্যামিতি কেমন, এবং এর সাম্প্রতিক প্রসারণ হার কত। পটভূমি বিকিরণ থেকেই আমরা জানতে পারি, মহাবিশ্ব প্রায় দিক-নিরপেক্ষ, ফলে এটি যে প্রায়-সমস্বত্ত্ব সে বিষয়েও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬.১১ মহাবিশ্বের বিবর্তন বিগব্যাং মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রায় ১,৩০০ কোটি বছর পূর্বে একটি পরমাণুর চেয়েও ছোট পরিসরে আমাদের চারপাশে আমরা যত পদার্থ ও শক্তি দেখি তা সবই ঘনীভূত ছিল। এই অতি ঘন ও অত্যুষ্ণ দশার (বিগ ব্যাং দশা) মহাবিশ্বই প্রসারিত হয়ে আজকের ব্রহ্মাণ্ডের রূপ নিয়েছে। প্রসারমান মহাবিশ্বের মডেলগুলোর সমন্বিত নাম ল্যাম্বডা-সিডিএম মডেল। এখানে 'সিডিএম' অর্থ কোল্ড ডার্ক ম্যাটার বা শীতল তমোবস্তু, এবং 'ল্যাম্বডা' চিহ্নটি মহাবিশ্বের ডার্ক এনার্জি অংশটির প্রতি আলোকপাত করে। বিগ ব্যাং দশায় পদার্থ ছিটকে আগে-থেকে- রয়ে-যাওয়া শূন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে – ব্যাপারটা এমনতরো বিস্ফোরণ নয়। একদম শুরু থেকেই সব স্থানই পদার্থ দ্বারা পূর্ণ ছিল, তবে আদিমকাল থেকে স্থান যত প্রসারিত হয়েছে পদার্থের গড়-ঘনত্ব তত কমেছে নিরন্তর। যখন থেকে গ্যালাক্সিরা তৈরি হয়েছে, তখন থেকেই তাদের গড় পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগ ব্যাং মডেল আমাদের আধুনিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেকগুলো আগাম পূর্বাভাস দিয়েছে যা পরীক্ষাযোগ্য। এখন পর্যন্ত এদের অধিকাংশই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ডেটা নিশ্চিত করেছে।

মহাবিশ্বের একটি অংশের ক্রমবিকাশ নিয়ে করা বৃহৎ পরিসরের মহাজাগতিক কম্পিউটার সিমুলেশন - গ্যাসের গতির উপর ডার্ক ম্যাটার ঘনত্বের প্রভাব দেখা যাচ্ছে

ছবি সৌজন্যে - The Illustris Collaboration

৭

সৌরজগতের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের সবার বসবাস।

ট্রাপিস্ট-১ নামক বাহ্যগ্রহ-ব্যবস্থায় নক্ষত্রকে ঘিরে কয়েকটি গ্রহ ঘুরবার কাল্পনিক চিত্র।

ছবি সৌজন্যে - ESO/M. Kornmesser

৭.১ আমাদের সৌরজগত আনুমানিক ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল।

উল্কাখণ্ডের তেজস্ক্রিয় ডেটিং প্রক্রিয়ার সাহায্যে সৌরজগতের বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। চান্দ্র শিলাখণ্ডের ডেটিং এবং ভূপৃষ্ঠের প্রাচীনতম শিলার যে বয়স নির্ণয় করা গেছে, ওই বয়স এগুলির সাথেও সংগতিপূর্ণ।

৭.২ সৌরজগত সূর্য, গ্রহ, বামন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং তুষারিত বস্তু দ্বারা গঠিত।

আমাদের সৌর পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল সূর্য। সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এবং এর মহাকর্ষীয় প্রভাবে আছে এমন সকল বস্তুই সৌরজগতের সদস্য। এই সকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হলো সকল গ্রহ ও তাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহ, বামন গ্রহ, গ্রহাণু, উল্কাণু এবং উল্কা। একা সূর্যই সমস্ত সৌরজগতের ৯৯.৮৭% ভরের অধিকারী।

৭.৩ সৌরজগতে আটটি গ্রহ রয়েছে।

গ্রহ হতে হলে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থার ২০০৬ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে তিনটি শর্ত মানতেই হবে। প্রথম শর্ত হচ্ছে একে অবশ্যই সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে একে যথেষ্ট ভরসম্পন্ন হতে হবে যাতে এর নিজস্ব প্রভাবে এটি মোটিমুটি বর্তুলাকৃতি ধারণ করতে পারে। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, এর মহাকর্ষীয় প্রভাব এমন হতে হবে যা এর পরিপার্শ্ব থেকে অন্যান্য সকল অবাঞ্ছিত বস্তুকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেসব বস্তু উপগ্রহ নয় এবং প্রথম দুটো শর্ত অনুসরণ করলেও তৃতীয়টি করে না, তারা বামন গ্রহ। সূর্যের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে এগুলে গ্রহগুলি হল- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

৭.৪ সৌরজগতে বেশ কয়েকটি বামন গ্রহ রয়েছে।

বামন গ্রহদের ব্যাস চাঁদের থেকে ছোট। চাঁদের ব্যাস প্রায় ৩,৪৭৪ কিলোমিটার। এখন পর্যন্ত বৃহত্তম বামন গ্রহ হলো প্লুটো। এছাড়া আছে [সাইজের ক্রমানুসারে] এরিস, হাউমিয়া, মাকিমাকি, ও সেরেস। এরা প্রত্যেকেই কঠিন বস্তু, এদের পৃষ্ঠভাগ তুষারিত, এবং এদের সকলের গঠনও সদৃশ। সেরেস মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে অবস্থিত, এবং অন্যান্য চারটি বামন গ্রহ নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে এজওয়ার্থ-কাইপার বেল্টে অবস্থিত।

৭.৫ সৌরজগতের গ্রহসমূহ দুইভাগে বিভক্ত -- পাথুরে গ্রহ এবং গ্যাস দানব।

সূর্যের নিকটবর্তী চারটি গ্রহ হলো পার্থিব গ্রহ। এদের সকলের পৃষ্ঠই কঠিন এবং মূলত পাথরে গঠিত। বুধগ্রহের কোনো বাতাবরণ নেই। তবে পৃথিবীর তুলনায় সবচেয়ে ঘন বাতাবরণ হলো শুক্রগ্রহের এবং সবচেয়ে পাতলা হল মঙ্গলগ্রহের। এই অন্তঃস্থ গ্রহগুলি অনেক ছোট হলেও এদের তুলনায় অন্য চারটি বহিঃস্থ গ্রহ অনেক বড় হয়-- এরা গ্যাস দানব বলে পরিচিত। এই গ্রহগুলো মূলত গ্যাসীয় (হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম) এবং এদের বাতাবরণ যথেষ্ট ঘন হয়। সকল গ্যাসদানবের চারদিকেই রিং আছে। শনিগ্রহের বলয়ব্যবস্থাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এবং ছোট্ট দুরবিন দিয়েই একে দেখা যায়।

৭.৬ কিছু গ্রহের কয়েক ডজনের মত প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

বুধ ও শুক্রগ্রহ ব্যতীত সকল গ্রহেরই অন্তত একটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীই সৌরজগতে একমাত্র গ্রহ যার একটিমাত্র উপগ্রহ আছে। মঙ্গলেরও আছে দুটো উপগ্রহ। পাথুরে গ্রহগুলোর তুলনায় গ্যাসদানবদের চারদিকে অনেকরকম বস্তুই ঘোরে। ৭৫টিরও বেশি সুনিশ্চিত উপগ্রহ নিয়ে – বৃহস্পতি ও শনি উভয়েই – সৌরজগতের সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বাভাবিক উপগ্রহ সমৃদ্ধ গ্রহ বলে বিবেচিত। এদের পরই থাকছে ইউরেনাস ও নেপচুন।

৭.৭ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তনরত তৃতীয় গ্রহ এবং চাঁদ এর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ।

সূর্য থেকে তৃতীয় গ্রহটি হলো আমাদের ধরিত্রী। এর কক্ষপথটি প্রায় গোলাকার। পৃথিবীর বাইয়ুমণ্ডলের প্রধান উপাংশ হলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এর পৃষ্ঠের ৭০% ই পানি, গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং এখন পর্যন্ত এটিই একমাত্র জ্যোতিষ্ক যার পৃষ্ঠে মানুষের পদছাপ পড়েছে।

৭.৮ লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু রয়েছে যারা সৌরজগতের আদি গঠনের অবশেষ।

সৌরজগতের সৃষ্টির আদিম সময়ের অবশেষ আজো কিছু রয়ে গেছে গ্রহাণুপুঞ্জে [মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে] এবং এজওয়ার্থ-কাইপার বেল্টে [নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে অবস্থিত] । এই গ্রহাণুগুলোর সাইজ একেক রকম-- ১০ মিটার থেকে শুরু করে ১০০০ কিলোমিটার লম্বা হতে পারে। সৌরজগতের সকল গ্রহাণুর সম্মিলিত ভর চাঁদের ভর অপেক্ষাও কম।

৭.৯ ধুমকেতু একটি তুষারিত বস্তু, এটি যখন সুর্যের কাছে আসে তখন সৌরতাপের কারণে এর একটি গ্যাসীয় পুচ্ছ দেখা যায়।

ধূমকেতুর মূল উপাদান তুষার হলেও এরা ধূলিকণা এবং পাথুরে জিনিস দিয়েও তৈরি হয়। এই তুষার বেশ উদ্বায়ী প্রকৃতির এবং সূর্যের কাছাকাছি এলে সৌরবায়ু এবং বিকিরণের প্রভাবে তা উবে যায়। এর ফলে দুটি পুচ্ছ তৈরি হয় – একটি হলো ধূলিপুচ্ছ যা বহুকোটি কিলোমিটার লম্বা হতে পারে এবং এটি ধূমকেতুর চলার পথের উল্টোদিকে কিছুটা বাঁকানো দেখা যায়; আরেকটি হলো প্লাজমা পুচ্ছ, এটি একদম সোজা থাকে এবং খালি চোখে সাধারণত দেখা দেয় না। ধূমকেতুর পুচ্ছদ্বয় সর্বদাই সূর্যের উল্টোদিকে হয়, ধূমকেতুর গতির দিক যা-ই হোক না কেন।বেশির ভাগ ধূমকেতুই দুটো জায়গা থেকে আসে – নেপচুনের কক্ষপথেরও বাইরে অবস্থিত এজওয়ার্থ-কাইপার বেল্ট থেকে এবং সৌরজগতের একদম প্রান্তদেশীয় উর্টের মেঘ থেকে।

৭.১০ সৌরজগতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলটির নাম হেলিওপজ (সৌরবিরতি)।

সূর্যের চুম্বকক্ষেত্রের বিস্তৃতি এর পৃষ্ঠ থেকেও অনেক দূরে পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে একটা দানবাকৃতির বুদ্বুদ মতো হয় যা পুরো সৌরজগৎকে ঘিরে থাকে। যে অঞ্চলে সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র অন্য নক্ষত্রের চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তার নাম হেলিওশীথ। এই অঞ্চলের বহির্ভাগকে বলে হেলিওপজ বা সৌরবিরতি। এ এক সংক্ষুব্ধ অঞ্চল। হেলিওপজের বাইরে আছে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থান। ভয়েজার-১ হলো প্রথম মনুষ্য-সৃষ্ট নভোযান যা ২০১২ সালে হেলিওপজ পার হয়ে যায়।

৮

আমরা সবাই নক্ষত্রধূলি দিয়ে তৈরি।

১৫০০ আলোকবর্ষ দূরের বিশালকায় নক্ষত্রটির অঞ্চল - কালপুরুষ নীহারিকা

ছবি সৌজন্যে – NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ ESA),Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

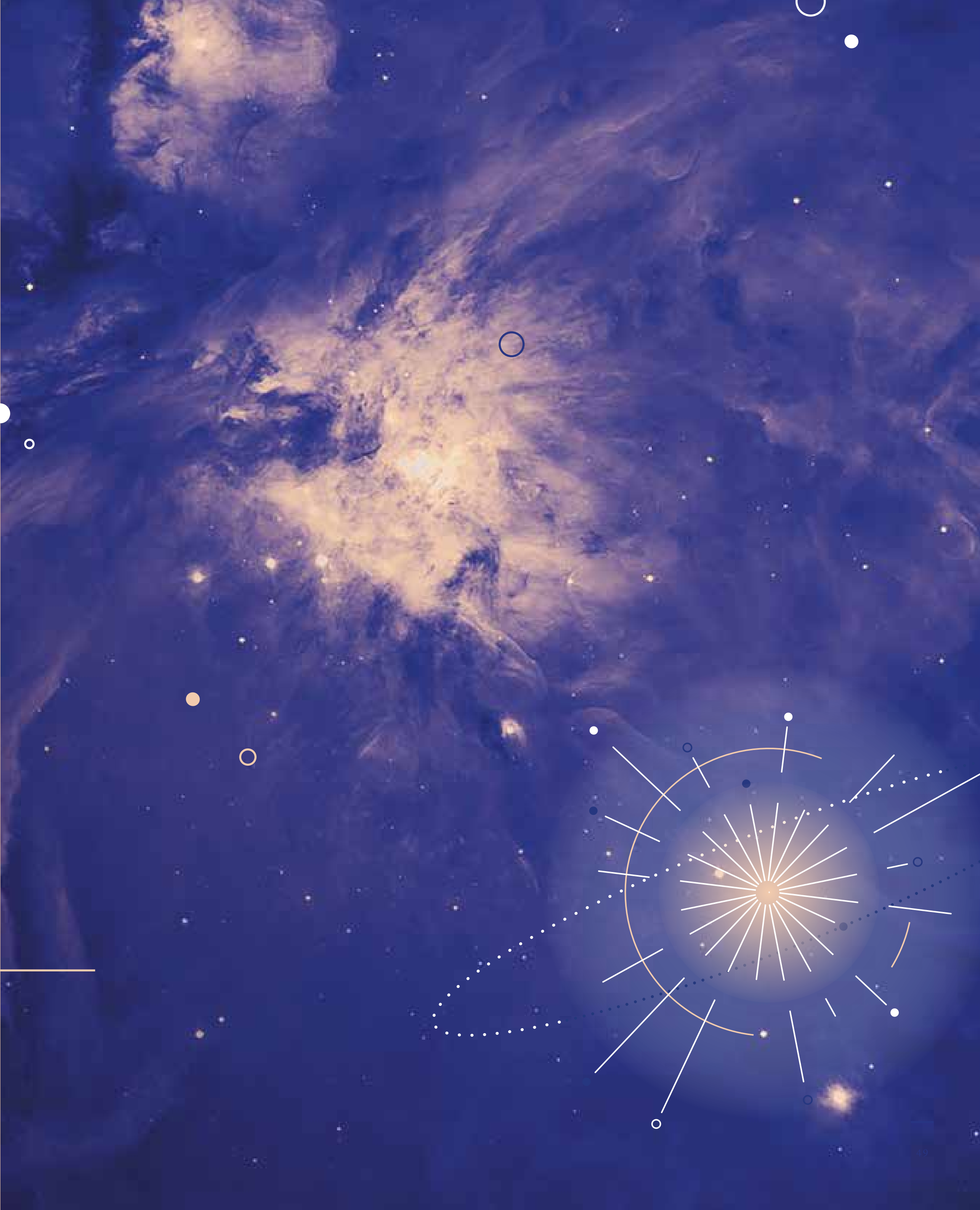

৮.১ নক্ষত্র হল একটি স্বদীপ্ত কায়া যা অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে।

নক্ষত্র হলো অতি উত্তপ্ত প্লাজমা যা স্বকীয় মহাকর্ষীয় বাঁধনে বাঁধা থাকে। প্লাজমা হল এমন এক গ্যাস যাতে পরমাণুর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস বিচ্ছিন্ন থাকে। নক্ষত্রের টেকসই শক্তি-নির্গমনের মূলে আছে এর কেন্দ্রে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নিউক্লিয়ার বা কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রোটন-প্রোটন শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সাহায্যে (এবং অধিকতর ভারী তারার ক্ষেত্রে কার্বন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন CNO চক্রের সাহায্যে) হাইড্রোজেনকে গলিয়ে হিলিয়ামে পরিণত করা হয় এবং পরবর্তী ধাপগুলিতে উচ্চতর মৌলগুলিকে ক্রমান্বয়ে একীভূত করা হয়। এই সকল মৌলিক ফিউশন প্রক্রিয়াগুলি থেকে উন্মুক্ত শক্তির বহির্মুখী চাপ নক্ষত্রকে নিজের মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাবার অন্তর্মুখী প্রবণতা থেকে রক্ষা করে স্থিতাবস্থায় রাখে। এভাবে সূর্যের কাছাকাছি ভর বা কম ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রেরা বহু কোটি কোটি বছর স্থিতাবস্থায় থাকে।

৮.২ ধূলা ও গ্যাসের অতিকায় মেঘ থেকে নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়।

শীতল বিশালকায় আণবিক মেঘের মহাকর্ষীয় পতন থেকেই নক্ষত্রের জন্ম হয়। এটি যত সংকুচিত হতে থাকে, ততই এটি বিভিন্ন কোর-অঞ্চলে বিভাজিত হতে থাকে এবং ঐ অঞ্চল্গুলির কেন্দ্রভাগ অধিকতর উত্তপ্ত ও ঘন হতে থাকে। তাপ ও চাপের সংকট মান অতিক্রম করলে তবেই কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নিউক্লিয়ার ফিউশন বা কেন্দ্রীণ গলন শুরু হয় এবং একটি তারা জ্বলে ওঠে। নক্ষত্রের জন্ম হয়। একদম শুরুর দিকে এই নবীন নক্ষত্রের চারপাশে থাকে গ্যাস ও ধূলির প্রোটোপ্লানেটারি ডিস্ক। কয়েক কোটি বছরে এই ডিস্ক খণ্ডে খণ্ডে বিভাজিত হয়ে গ্রহ এবং অন্যান্য ছোট বস্তু তৈরি করে।

৮.৩ পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটি সূর্য।

পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র সূর্য এত বড় যে এর মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ পৃথিবী ধরে যাবে এবং সূর্যের বিষুবীয় ব্যাস ১৪ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য অনেক বড় হলেও এই মহাবিশ্বে সূর্য অপেক্ষা বহুগুণে বড় তারাও আছে। যেমন VY Canis Majoris নামের নক্ষত্রটি এই পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় নক্ষত্র এবং এর ব্যাস সূর্যের তুলনায় ১,৪০০ গুণ! এটি একটি অতিদানবতারা বা সুপারজায়ান্ট। সৌরজগতের কেন্দ্রে এটিকে রাখলে নক্ষত্রটির পৃষ্ঠ বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথও ছাড়িয়ে যাবে। সূর্যের তুলনায় ছোট অনেক নক্ষত্রও আছে। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরি একটি লাল বামন তারা যার ব্যাস মাত্র দুই লক্ষ কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র ১৬ গুণ!

৮.৪ সূর্য একটি সদা পরিবর্তনশীল নক্ষত্র।

সূর্যের পৃষ্ঠভাগ দেখতে মসৃণ হলেও এখানে কালো কালো অনেক দাগও থাকে। এইসব সৌরকলঙ্ক কালো দেখায় কারণ এদের তাপমাত্রা আশপাশের তাপমাত্রা থেকে তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু এদের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রবল থাকে। প্রতি ১১ বছরে এরা একটা চক্র অনুসরণ করে-- একবার অনেক বেশি সংখ্যক দাগ দেখা যায়, তো পরের বার অনেক কম সংখ্যক দাগ হয়। কখনও সূর্যের চৌম্বকরেখাগুলো পেঁচিয়ে যায়, তখন প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়। এই শক্তি যখন নির্গত হয় তখন অনেক কণা ও আলোর ঝলকানি দেখা যায়। এদের বলা হয় সৌরঝলক বা করোনাল মাস ইজেকশন। কিন্তু যখন শান্ত থাকে, তখনও সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন কিলোগ্রাম ভরের উষ্ণ ও চুম্বকায়িত গ্যাস মহাশূন্যে নির্গমন করে। এই সৌরবায়ু সৌরজগতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্যান্য গ্রহসমূহের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। অন্যান্য নক্ষত্রেরও ঝলক ও নাক্ষত্রিক বায়ু নির্গত হয়।

৮.৫ নক্ষত্রের রং থেকে তার পৃষ্ঠ তাপমাত্রার হদিস পাওয়া যায়।

নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। উত্তপ্ত নক্ষত্র তাদের শক্তি বিকিরণ করে বিদ্যুৎচুম্বক বর্ণালীর নীল ও অতিবেগুনি অঞ্চলে (ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যে)। এজন্য আমাদের চোখে এদের নীলাভ দেখায়। শীতলতর নক্ষত্র রক্তিমাভ হয়। এদের শক্তির একটা বড় অংশ বিকিরণ হয় বিদ্যুৎ-চুম্বক বর্ণালির লাল ও অবলোহিত অঞ্চলে (দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে)।

৮.৬ দুটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে সাধারণত অত্যন্ত ফাঁকা স্থান থাকে অথবা এর মাঝে গ্যাসের মেঘ থাকতে পারে- যেখান থেকে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিতে পারে।

নক্ষত্রদের মধ্যবর্তী স্থানে নগণ্য পরিমাণ পদার্থ থাকে। এই পদার্থের রকম হলো গ্যাস, ধূলিকণা ও উচ্চশক্তির কণা (মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে)। এই পদার্থকেই বলে আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যম। ছায়াপথের বিভিন্ন অংশে এর ঘনত্ব কোথাও কম, কোথাও বেশি। তথাপি আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যমের তুলনামূলক ঘন অঞ্চলের ঘনত্বও পৃথিবীর ল্যাবরেটরিতে সৃষ্ট ভ্যাকুয়ামের তুলনায়ও ১০০০ গুণ পাতলা হয়।

৮.৭ নক্ষত্রের একটি জীবনচক্র থাকে যা তার প্রাথমিক ভর দ্বারা নির্ণীত হয়।

কম্পিউটার সিমুলেশন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথম নক্ষত্রগুলির আয়ুষ্কাল কয়েক মিলিয়ন বছর ছিল। তুলনায় সূর্যের মত একটি নক্ষত্রের গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ১০,০০০ কোটি বছর। কম-ভর বিশিষ্ট লাল বামন তারাদের জীবনকাল তো আরো দীর্ঘ-- ট্রিলিয়ন বছর। সূর্য-সম ভর-বিশিষ্ট একটি নক্ষত্র ক্রমে একটি লাল দানব তারায় পরিণত হবে। পরবর্তীতে এর অধিকাংশ ভর মহাশূন্যে হারিয়ে ফেলে এবং পড়ে থাকে শুধু একটি সাদা বামন তারা এবং একে ঘিরে থাকা একটি গ্রহগত নীহারিকা। সূর্যের অন্তত আটগুণ ভরবিশিষ্ট একটি নক্ষত্রের জীবনকাল শেষ হয় একটি লাল সুপারজায়ান্ট তারায়। এরপর একটি ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনাটির নাম সুপারনোভা। শেষে পড়ে থাকে একটি নিউট্রন তারা বা একটি নাক্ষত্রিক কৃষ্ণবিবর।

৮.৮ অতি ভারী নক্ষত্রগুলো কৃষ্ণবিবর (নাক্ষত্রিক) হিসেবে জীবনচক্র সমাপ্ত করে।

কৃষ্ণবিবর হলো মহাকাশের এমন এক অঞ্চল যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত বেশি প্রবল যে, ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করে গেলে কোনো কিছুই, এমনকি আলোও, বের হতে পারে না। ঘটনা-দিগন্ত হলো কৃষ্ণবিবরকে আবৃত করে রাখা একটি সীমান্ত-পৃষ্ঠ (বাউন্ডারি সারফেস)। এই পৃষ্ঠতলের যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে যে মুক্তিবেগ প্রয়োজন, সেটা আলোর দ্রুতির চেয়েও বেশি। তত্ত্বমতে, ব্ল্যাক-হোলের কেন্দ্রে আছে একটি সিঙ্গুলারিটি বা এমন এক ব্যতিক্রমী বিন্দু যেখানে পদার্থের ঘনত্ব ও স্থান-কালের বক্রতা অসীম হয়ে যায়। যেসব ব্ল্যাক-হোলের ভর বিশ-ত্রিশ গুণ বা ঐরকম, তাদেরকে নাক্ষত্রিক ভরের কৃষ্ণবিবর বলে। ভর অনুযায়ী এদের ব্যাসার্ধ কয়েক কিলোমিটার থেকে বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার বা তারও বেশি হতে পারে।

৮.৯ নতুন নক্ষত্র এবং তাদের গ্রহমন্ডলী ঐ অঞ্চলের পূর্বতন নক্ষত্রের ধ্বংসাবশিষ্ট বস্তু থেকে জন্ম নেয়।

হাইড্রোজেন, অধিকাংশ হিলিয়াম ও কিছুটা লিথিয়াম ছাড়া মহাবিশ্বের আর সকল মৌল কোনো-না-কোনো নক্ষত্রের ভেতরে কেন্দ্রীণ সংযোজন বিক্রিয়ার [নিউক্লিয়ার ফিউশন] মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের মতো নিম্ন-ভর বিশিষ্ট নক্ষত্রে অক্সিজেন পর্যন্ত মৌল তৈরি করতে পারে। কিন্তু ভারী তারার অভ্যন্তরে অক্সিজেনের চেয়েও ভারী মৌল তৈরি হতে পারে, অবশ্য কেবল লোহা পর্যন্ত। স্বর্ণ বা ইউরেনিয়ামের মত লোহার চেয়েও ভারী মৌল তৈরি হয় উচ্চ-শক্তির সুপারনোভা বিস্ফোরণ বা নিউট্রন তারার সংঘর্ষের ফলে। অন্তিম মুহূর্তে নক্ষত্র তার সকল ভর আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যমে উগরে দেয়। এই পদার্থ থেকেই পরে নতুন আরেক নক্ষত্র জন্ম নেয় -- মহাজাগতিক জন্মান্তর যেন!

৮.১০ মানবদেহস্থ পরমাণুগুলির উৎস পূর্বতন নক্ষত্রগুলোতে পাওয়া যেতে পারে।

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও কিছুটা লিথিয়াম ছাড়া সকল মৌলই নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে। জীবনকালের শেষে ঐ নক্ষত্র এসব মৌলই মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে দেয়। এভাবেই আমাদের শরীরে যে মৌলগুলো প্রয়োজন, যেমন হাড়ের ক্যালসিয়াম, রক্তের লৌহ, ডিএনএ'র নাইট্রোজেন ইত্যাদি, সেগুলো সবই এভাবেই তৈরি হয়। একইভাবে অন্য জন্তু, প্রাণী, উদ্ভিদের মৌল উপাদান এবং আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি তার বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে নক্ষত্রের ভেতরে, বিলিয়ন বছর আগে।

এনজিসি ১০৪ বা ৪৭-টুকানাই নামক বর্তুলাকার তারাস্তবকের ছবি - এটি রাতের আকাশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম বর্তুলাকার তারাস্তবক।

ছবি সৌজন্যে - ESO

৯

মহাবিশ্বে নিখর্ব সংখ্যক (কয়েক শত বিলিয়ন) নক্ষত্র রয়েছে।

হাবল আল্ট্রা ডিপ ফিল্ড - পূর্ণিমার চাঁদের মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ জায়গায় দশ হাজার গ্যালাক্সির সমাবেশ।

ছবি সৌজন্যে - NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), HUDF Team

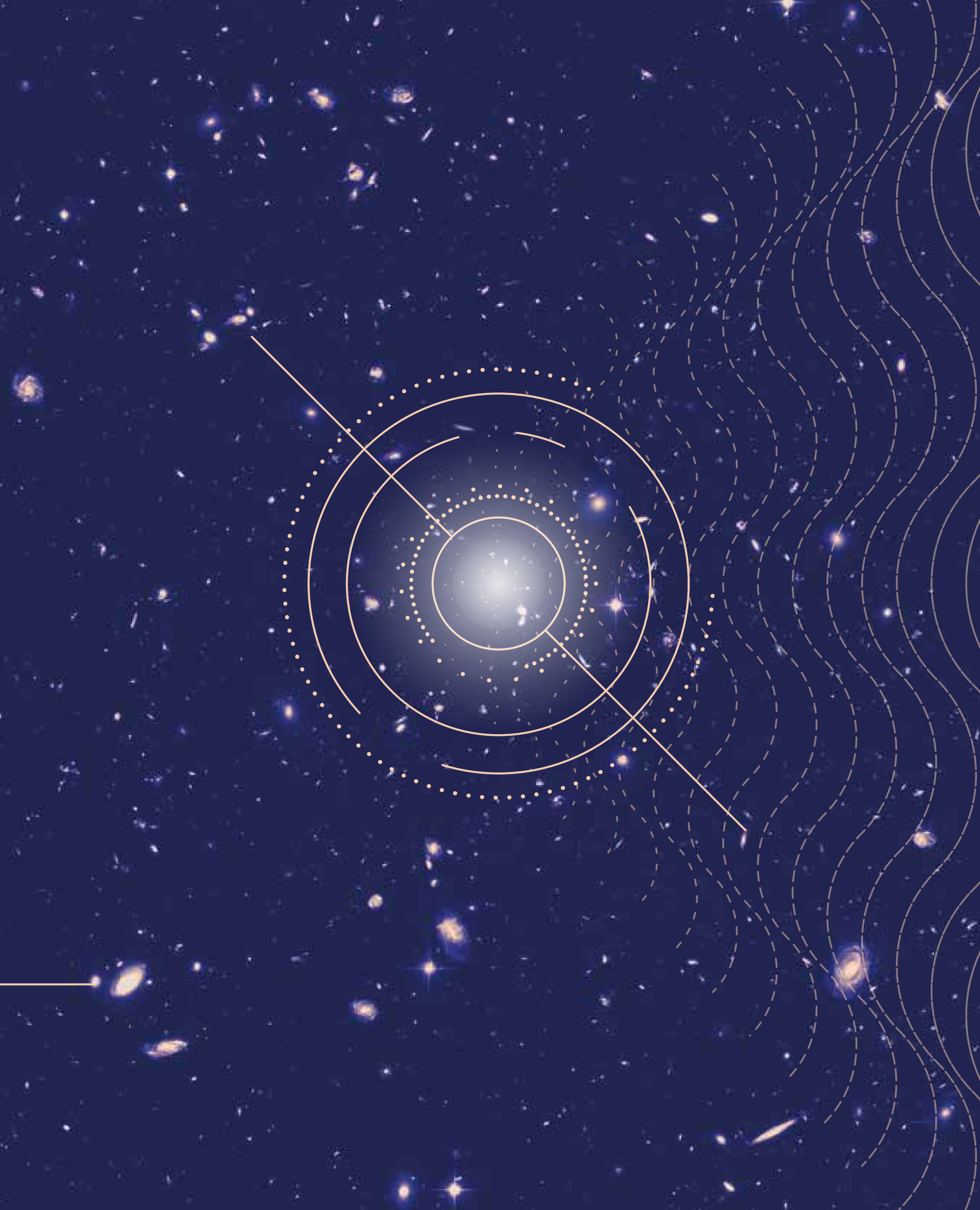

৯.১ গ্যালাক্সি হল নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং গ্যাসের একটি বৃহৎ সমাহার।

একটি গ্যালাক্সিতে কয়েক মিলিয়ন থেকে কয়েকশত বিলিয়ন নক্ষত্র থাকতে পারে। এরা সকলেই পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণে আবদ্ধ। গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্রেরা স্তবকভুক্ত থাকতে পারে আবার নক্ষত্রের বিশেষ দলের অংশ হিসেবেও থাকতে পারে। এছাড়াও একটি গ্যালাক্সিতে নাক্ষত্রিক অবশেষ, ধূলা, গ্যাস ও ডার্ক ম্যাটার থাকে। অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই অতিভারী কৃষ্ণবিবর থাকে।

৯.২ গ্যালাক্সি বিপুল পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার ধারণ করে।

তমোবস্তু বা ডার্ক ম্যাটার এক ধরনের পদার্থ যা বিদ্যুৎচুম্বক বিকিরণ নিঃসরণও করে না বা বিদ্যুৎচুম্বক মিথস্ক্রিয়াও দেখায় না। ফলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে এদের কখনওই দেখা যায় না। দেখা না গেলেও এধরনের পদার্থের ভর আছে এবং অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর ওপর এদের মহাকর্ষীয় প্রভাব থেকে এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লিখিত মহাকর্ষীয় প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে দৃশ্যমান বস্তুর গতির ওপর প্রভাব কিংবা দূরের জ্যোতিষ্কের আলোর মহাকর্ষীয় লেন্সিংয়ের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্বের বিকৃতি উল্লেখ করা যায়। গ্যালাক্সিকে সব দিক দিয়েই ডার্ক ম্যাটারের একটা বিশালকায় হেলো বা কীরিট যেন ঘিরে রাখে-- ফলে গ্যালাক্সির যতটুকু আমরা দেখি সেটা শুধুই হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র।

৯.৩ গ্যালাক্সির গঠন একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া।

মহাবিশ্বের ইতিহাসের প্রথম কয়েক নিযুত বছরে ডার্ক ম্যাটার বা তমোবস্তু অসংখ্য বিশালকায় ও ঘনতর অঞ্চলের হেলো বা কীরিটে রূপান্তরিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এই হেলো-অঞ্চলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম জড়ো হতে শুরু করে এবং প্রথম প্রজন্মের গ্যালাক্সি ও প্রথম নক্ষত্রেরা জন্ম নেয়। বৃহদাকৃতির কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি, যেমন আকাশগঙ্গা, তুলনামূলক ছোট অনেক গ্যালাক্সিকে আকর্ষণ ও আত্মীকৃত করে ক্রমশ বড় এবং ভারী হয়েছে। বৃহদাকার উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে ভারী গ্যালাক্সিসমূহের সংঘর্ষ ও একীভবনের মাধ্যমে। এই সকল গ্যালাক্সিতে গ্যাসের সঞ্চয়, বিস্ফোরণশীল নক্ষত্র ও গ্যালাকটিক কেন্দ্রের সক্রিয়তার কারণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ধরন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির হার বাড়ে বা কমে।

৯.৪ গ্যালাক্সি মূলত তিন ধরণেরঃ কুণ্ডলিত, উপবৃত্তাকার এবং অনিয়মিত।

ছবিতে যেমন দেখায়, তার ভিত্তিতে গ্যালাক্সিদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয় – কুণ্ডলিত, উপবৃত্তাকার, ও অনিয়মিত গ্যালাক্সি। শুধু আকৃতিগত পার্থক্যই নয়, এদের গঠনোপাদানও ভিন্ন। কুণ্ডলিত গ্যালাক্সির কুণ্ডলিত বাহুগুলো অনেকটাই চ্যাপ্টা হয়ে যায় যাদের মূল উপাদান হলো উজ্জ্বল নতুন তারা এবং প্রচুর গ্যাস ও ধূলিকণা। কিন্তু উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিদের গ্যাস খুব কমই থাকে। এদের নক্ষত্রগুলো বেশির ভাগই বয়োবৃদ্ধ এবং এদের বণ্টন ‘ওভয়েড’ কিংবা বর্তুলাকার শেইপের হয়। অন্যান্য গ্যালাক্সি এবং বেশির ভাগ বামন গ্যালাক্সিই এ দুটোর কোনোটাতেই পড়ে না। এরা অনিয়মিত প্রকৃতির হয়।

৯.৫ আমরা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নামের একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সিতে বসবাস করি।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ একটি কুণ্ডলিত ছায়াপথ। এর কেন্দ্রে একটি দণ্ডাকৃতির কাঠামো আছে। সৌরজগৎ এর কেন্দ্র থেকে ২৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে একটি কুণ্ডলিত বাহুতে অবস্থিত। এই ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশটি একটি চাকতি-সদৃশ নক্ষত্রের সমাহার যার ব্যাস প্রায় ১,০০,০০০ – ১,২০,০০০ আলোকবর্ষ এবং পুরুত্বে প্রায় ২,০০০ আলোকবর্ষ। এই ডিস্কের সমতলেই নবীন তারা ও ধূলা মিলে কুণ্ডলিত বাহু গঠন করে। রাতের আকাশে, যদি ভাল অন্ধকার স্থান থেকে লক্ষ করা সম্ভব হয় তাহলে, এই গ্যালাকটিক ডিস্কের প্রায় ১০,০০০ কোটিরও বেশি নক্ষত্র সমাহারের একটা খণ্ডাংশ শুধু দেখা যাবে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একটা বড় ও অস্পষ্ট আলোর ফিতার মত একে দেখা যায়। নিজেদের গ্যালাক্সির ভেতর থেকে একে এভাবেই আমরা দেখি।

৯.৬ গ্যালাক্সির কুণ্ডলিত বাহু গ্যাস এবং ধূলিকণা জমা হয়ে গঠিত হয়।

কুণ্ডলিত বাহু কীভাবে এলো সেই সম্পর্কিত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বটির মতে গ্যালাক্সির ডিস্ক বরাবর ঘনত্ব-তরঙ্গের চলাচলের ফলে কুণ্ডলিত বাহু সৃষ্টি হয়। যেমন একটা ব্যস্ত সড়কে জ্যামের ফলে গাড়ি ধীরে এগোয়, তেমনি ঘনত্ব-তরঙ্গের ফলে নক্ষত্র, গ্যাস ও ধূলিকণাও শ্লথগতিতে দলবেধে চলে। উচ্চ ঘনত্বের এইসব অঞ্চলে প্রচুর গ্যাস ও ধুলো থাকে। নতুন তারা সৃষ্টির জন্য এরা অপরিহার্য। এইজন্য কুণ্ডলিত বাহুতে নবীন তারার সংখ্যা বেশি এবং এই অঞ্চলে নক্ষত্র জন্মের হারও বেশি।

৯.৭ বেশিরভাগ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি অতিভারী কৃষ্ণবিবর থাকে।

একটা গড়পড়তার গ্যালাক্সিতে গড়ে ১০ কোটি সংখ্যক নাক্ষত্রিক ভরের কৃষ্ণবিবর থাকে। ভারী তারার সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই ধরনের কৃষ্ণবিবর তৈরি হয়। অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতিভারী কৃষ্ণবিবর থাকে। এই ধরনের দানবাকৃতির ব্ল্যাকহোলের ভর কয়েক মিলিয়ন থেকে এক বিলিয়ন সৌরভরেরও বেশি হতে পারে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি অতিভারী ব্ল্যাক-হোল আছে যার ভর চল্লিশ লক্ষ সৌরভরের সমান। ২০১৯ সালে সারা দুনিয়াজোড়া ৮টি রেডিও টেলিস্কোপের ডেটা একত্রিত করে বৃহদাকার উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি M-87এর কেন্দ্রস্থ কৃষ্ণবিবরটির ঘটনা-দিগন্তের অবয়ব বা ছায়ার প্রথম প্রত্যক্ষ ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।

৯.৮ গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে বহুদূরে অবস্থিত হতে পারে।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশী হলো ক্যানিস মেজর নামের একটি বামন গ্যালাক্সি। দুরত্ব প্রায় ২৫,০০০ আলোকবর্ষ। দূরান্তের গ্যালাক্সি দেখতে খুবই ক্ষীণ হয় এবং প্রায় দেখাই যায় না। তাই দূরান্তের গ্যালাক্সির ছবি তুলতে হলে উচ্চ বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন বড় টেলিস্কোপ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দীর্ঘ এক্সপোজারের মাধ্যমে যথেষ্ট আলো সংগ্রহও করতে হয়।

৯.৯ গ্যালাক্সিগুলো ক্লাস্টার বা গুচ্ছকারে থাকে।

গ্যালাক্সিরা সারা বিশ্বজুড়ে এলোমেলো ছড়িয়ে নেই। যেকোনো গ্যালাক্সিই কোনো না কোনো গ্যালাক্সি-স্তবকের অংশ। এইসব গ্যালাক্সি-স্তবকে কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে। এইসব গ্যালাক্সি-স্তবক আবার আরও বড় কাঠামোর অংশ হয়ে থাকে যাকে বলে সুপারক্লাস্টার। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছের অংশ, যাদের সদস্য সংখ্যা ৫৪টিরও বেশি গ্যালাক্সি। এই স্থানীয়-গুচ্ছ আবার বৃহত্তর কন্যাস্তবকের বাইরের দিকের সদস্য, কন্যাস্তবক আবার ভার্গো সুপারক্লাস্টারের অংশ, যা আবার লানিয়াকেয়া সুপারক্লাস্টারের অংশ।

৯.১০ গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের সাথে মহাকর্ষ বলের দ্বারা মিথস্ক্রিয়া করে।

গ্যালাক্সিদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া তাদের আকৃতি ও বিবর্তন নির্ধারণ করে। আগে মনে করা হতো যে, এক টাইপের গ্যালাক্সি জীবনকালের এক পর্যায়ে বিবর্তিত হয়ে অন্য টাইপে বদলে যায়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেখাচ্ছে যে কোনো কোনো শ্রেণির গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে তার বর্তমান প্রকৃতির জন্য দায়ী মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া। যেমন পূর্বতন অনেক বৃহদাকার গ্যালাক্সির একীভবনের ফলে উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি তৈরি হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া আবার প্রকারান্তরে মিথস্ক্রিয়াশীল গ্যালাক্সিগুলোতে ব্যাপক আকারে নক্ষত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে ।

সেন্টরাস-এ গ্যালাক্সির একটি রঙিন কম্পোজিট ছবি যেখানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কৃষ্ণবিবরের পার্শ্ববর্তী লোব এবং নির্গত জেট দেখা যাচ্ছে।

ছবি সৌজন্যে - ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/ CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

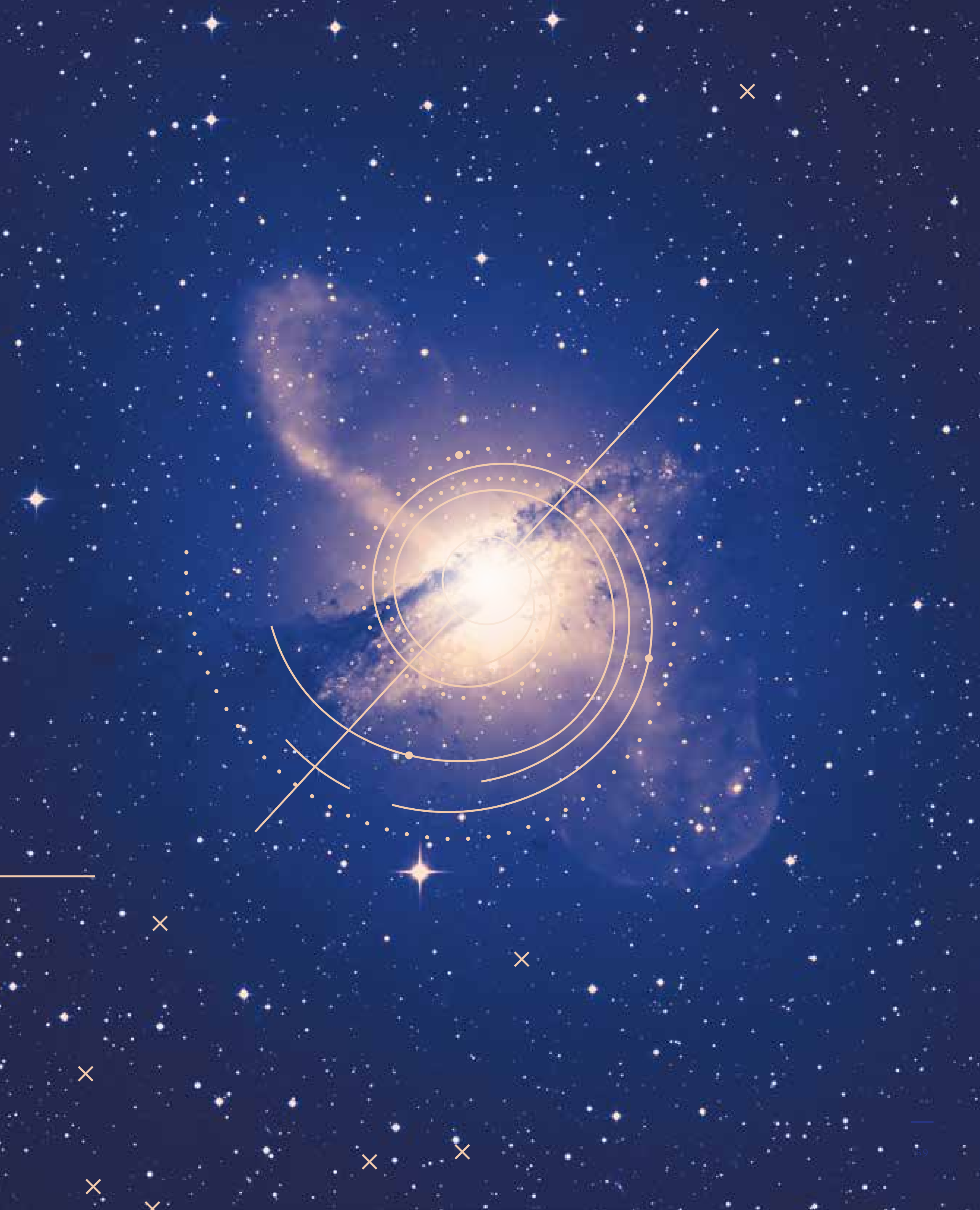

১০ এই মহাবিশ্বে আমরা সম্ভবত নিঃসঙ্গ নই।

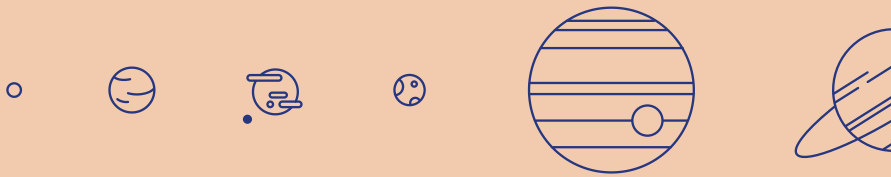

দেড় বিলিয়ন কিলোমিটার দুরে শনিগ্রহের কাছ থেকে তোলা ক্যাসিনি নভোযানের এই ছবিতে পৃথিবী ও চাঁদকে একত্রে দেখা যাচ্ছে।

ছবি সৌজন্যে - NASA/JPL-Caltech/ Space Science Institute

১০.১ পৃথিবীর বাইরেও জৈব অণু সনাক্ত করা হয়েছে।

জৈব যৌগে কার্বন থাকে। এই কার্বনই আবার আমরা জীবন বলতে যা জানি তার গাঠনিক উপাদান। আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে মহাশূন্যেও জৈব যৌগ, যেমন সরল অ্যামিনো অ্যাসিডের বীজ, আছে। উল্কা এবং উল্কাপিণ্ডেও জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে, এমনকি একটি অ্যামিনো অ্যাসিডও। কাজেই এটা খুবই সম্ভব, যে গ্যাস এবং ধূলোর মেঘ থেকে আমাদের সৌরজগৎ তৈরি হয়েছে সেখানেও এ ধরনের যৌগসমূহ আগে থেকেই ছিল।

১০.২ পৃথিবীর অনেক চরমভাবাপন্ন পরিবেশেও জৈবসত্তার বেঁচে থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

অধিকাংশ জীব পৃথিবীর পারিবেশিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং সংবেদনশীল। তবে কিছু চরমপন্থী প্রাণসত্তা, এক্সট্রিমোফাইল, আছে যারা চরমভাবাপন্ন পরিবেশে বাস করে। অর্থাৎ যেখানে কল্পনাও করা যায়নি, সেখানেও জীবন পল্লবিত হয়েছে। তাপমাত্রা, চাপ, পি-এইচ ভ্যালু ও বিকিরণ সম্পাতের একটা বড় পরিসরে [বদল হলেও] এদের কিছু হয় না। এই জীবদের সহনক্ষমতা খুবই ভালো। এদের অনেকেই মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, মহাসমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে, ভূ-ত্বকের নিচে ও এমনকি আগ্নেয়গিরির মত চরম ও পরম পরিবেশে বাস করে। এদের একটিকে এমনকি ভ্যাকুয়ামের কন্ডিশনেও বাস করতে দেখা গেছে। এইসব ঘটনা অন্য গ্রহ ও উপগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক আশাবাদকে উসকে দেয়। কারণ এসব জায়গাতেও সাংঘাতিক সব চরম পরিবেশের দেখা মেলে।t

১০.৩ মঙ্গল গ্রহে সম্ভাব্য তরল পানির সন্ধান আদিম প্রাণসত্তার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্য তরল পানি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রভাবক। এইজন্য অপার্থিব প্রাণের সন্ধানে অন্য গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহে তরল পানির অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিগত বছরগুলিতে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে তরল জলের সম্ভাব্য চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। এই ঘটনা মঙ্গলে পানি থাকা না-থাকার দীর্ঘ বিতর্কে নতুন সূত্র দিয়েছে। মঙ্গলে এখন তরল পানি আছে কিনা তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে জোর তর্ক আছে। তবে এর সম্ভাব্য চিহ্ন এই ধারণার সমর্থন দেয় যে কোনো এককালে এখানে সরল অণুজীব থাকলেও থাকতে পারে। এখন যদি মঙ্গলের পৃষ্ঠের গভীরে তরল জল থেকে থাকে, তাহলে সেখানে প্রাণের অস্তিত্বও সম্ভব।

১০.৪ সৌরজগতের কিছু প্রাকৃতিক উপগ্রহে প্রাণের উপযোগী অনুকূল শর্ত উপস্থিত।

সৌরজগতের দানবগ্রহগুলিকে ঘিরে এমন অনেক উপগ্রহই আছে যাদের ঘন বাতাবরণ ও আগ্নেয়-সক্রিয়তা রয়েছে যা পার্থিব গ্রহের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। বৃহস্পতির বড় উপগ্রহ ইউরোপার তুষারিত পৃষ্ঠের নিচে সম্ভবত তরল সমুদ্র আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সমুদ্রে সরল জীবের জন্য উপযুক্ত শর্তাবলি থাকা সম্ভব। শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানেও সরল জীবসত্তা থাকতে পারে। কারণ টাইটানের আছে জটিল জৈব যৌগের সমৃদ্ধ সম্ভার, ঘন বাতাবরণ, পৃষ্ঠের তরল মিথেন এবং একটি অনুকল্পিত ভূগর্ভস্থ পানির সমুদ্র।

১০.৫ সূর্য ছাড়াও অন্য নক্ষত্রকে ঘিরে প্রচুর গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, এদেরকে বাহ্যগ্রহ বলে।

সূর্য ছাড়া অন্য নক্ষত্রে গ্রহ খুঁজে পাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক হাজার এক্সোপ্লানেট বা বাহ্যগ্রহ খুঁজে পাওয়া গেছে। নয়া বাহ্যগ্রহের সংখ্যা প্রতিনিয়তই সূচকীয় হারে বেড়ে চলেছে। এখন আমরা সূর্যের নিকটস্থ অঞ্চলের বাহ্যগ্রহগুলিকে বিশ্লেষণও করতে পারছি।

১০.৬ বাহ্যগ্রহগুলো অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় এবং প্রায়ই এরা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে।

বাহ্যগ্রহদের ভৌত ও কক্ষীয় বৈশিষ্ট্য বহু বিচিত্র। এদের কারোর ভর বুধগ্রহের মত, আবার কারুর ভর বৃহস্পতির কয়েক গুণ। এদের ব্যাসার্ধ কয়েকশ কিলোমিটার থেকে শুরু করে বৃহস্পতির ব্যাসার্ধের কয়েক গুণ পর্যন্ত হতে পারে। বাহ্যগ্রহদের কক্ষীয় আবর্তনের সময়সীমা কয়েক ঘন্টাও হতে পারে (অত্যন্ত অল্প) এবং তাদের কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা সৌরজগতে দেখা ধূমকেতুগুলোর মত দীর্ঘও হতে পারে। অধিকাংশ বাহ্যগ্রহ একটি সিস্টেমের অংশ হিসেবে থাকে, যেখানে তারা আরো কয়েকটি গ্রহকে নিয়ে একই নক্ষত্রকে ঘিরে ঘোরে।

১০.৭ আমরা এখন পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ শনাক্তকরণের কাছাকাছি চলে এসেছি।

বাহ্যগ্রহ নিরূপণের পদ্ধতিসমূহকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম ও পদ্ধতিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে এবং এখন পৃথিবীর ভরের মতো কম ভর এবং এর ব্যাসার্ধের অনুরূপ ছোট সাইজের গ্রহ খুঁজে পাবার মোটামুটি দোড়গোড়ায় আমরা পৌঁছে গেছি। এখন পর্যন্ত আমাদের এই সন্ধান দেখিয়েছে যে সূর্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বাহ্যগ্রহ আছে। এদের অনেকেই তাদের নক্ষত্রের চারদিকে সেই তথাকথিত প্রাণবান্ধব অঞ্চলে থেকে ঘোরে। সংজ্ঞানুসারে, যে গ্রহটি প্রাণবান্ধব অঞ্চলে থাকে, সেটি তার নক্ষত্র থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে তা ঐ গ্রহের পৃষ্ঠে পানিকে তরল রাখতে যথেষ্ট।

১০.৮ বিজ্ঞানীরা অপার্থিব বুদ্ধিমত্তার সন্ধান করছেন।

অপার্থিব বুদ্ধিমত্তা সন্ধানের একটি উপায় হলো এমন সংকেত খুঁজে বের করা যা জ্ঞাত কোনো মহাজাগতিক প্রপঞ্চের দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই ধরনের সংকেত পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধানের নাম হল 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স' (SETI)। এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংকেত পাওয়া যায়নি। তবে 'সেটি' আকাশ অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে, যদি পৃথিবীর বাইরে ধীমান সভ্যতার কোনো সূত্র মেলে!

> এই মহাবিশ্বে পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান, একে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের কৃত্রিম আলো দেখা যাচ্ছে।

ছবি সৌজন্যে – NASA

১১.১ আলোক দূষণ মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে।

কোটি বছর ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রজাতিকুল কৃত্রিম আলোর অনুপস্থিতিতেই জৈবধর্ম পালন করেছে, এবং সেই ভিত্তিতেই দৈনিক বা নৈশ সক্রিয়তায় অভ্যস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর থেকে কৃত্রিম আলোর সহায়তায় মানুষ রাতের অন্ধকারকে অনেকটা দূর করে দিয়েছে। এটা কিন্তু মারাত্মক আলোর দূষণ ঘটাচ্ছে এবং এটা পৃথিবীর পরিবেশ, প্রাণীদের আচরণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ প্রাণিজগৎ দিবা ও নৈশকালীন প্যাটার্নের ওপর নির্ভরশীল। সারা দুনিয়া জুড়েই কৃত্রিম আলোর দূষণ বন্যপ্রাণীর আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রজনন, কিংবা দিক-সচেতনা থেকে শিকার – সবতাতেই এই প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে। আমরাও অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ (ডার্ক স্কাই) হারিয়ে ফেলছি, অথচ এটা ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি অনেক শহর ও শহরতলীতে রাতের বেলা আকাশগঙ্গা ছায়াপথই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

১১.২ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রচুর মানব সৃষ্ট বর্জ্য বিদ্যমান।

মহাকাশ প্রযুক্তির (স্পেস টেকনোলজি) উন্নতির ফলে মানুষ রকেটের সাহায্যে নানাবিধ বস্তুকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করেছে। স্পেস এক্সপ্লোরেশন যুগের শুরু থেকেই মহাশূন্যে মানব-সৃষ্ট কৃত্রিম বর্জ্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন রকেটের যন্ত্রাংশ বা পুরনো স্যাটেলাইট। বর্তমানে জানামতে, পৃথিবীকে ঘিরে এই মুহূর্তে প্রায় ৫,০০,০০০ মানবসৃষ্ট কৃত্রিম বর্জ্য ঘুরছে। এদেরকে স্পেস জাঙ্ক বলে। যেহেতু এই বর্জ্যগুলো উচ্চ গতিতে চলে, তাই কোনো নভোযান বা স্যাটেলাইটের সাথে এদের সংঘর্ষ গুরুতর ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন এবং অন্যান্য মনুষ্য অভিযাত্রী-বাহী নভোযানের জন্য ঝুঁকি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মহাশূন্যের এসব বর্জ্য মনিটর করা এবং পুরনো স্যাটেলাইট ও ভাঙা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

১১.৩ মহাশূন্যে সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তুসমূহের উপর আমরা নজর রাখছি।

সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে নবগঠিত গ্রহসমূহের সাথে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় গ্রহাণু-সদৃশ বস্তুর সাথে সুপ্রচুর সংঘর্ষ ঘটেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে দৃশ্যমান বিপুল সংখ্যক ক্রেটার এবং চাঁদের বুকে দৃশ্যমান অসংখ্য খানাখন্দ এ কথা প্রমাণ করে যে এ ধরনের সংঘর্ষ (ইমপ্যাক্ট) কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে একটা বড় গ্রহাণুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষের ফলে উড়তে-অক্ষম ডাইনোসরসহ অন্যান্য বহু সংখ্যক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। তবে এটা নিয়ে এখনও প্রচুর গবেষণা ও বিতর্ক চলমান আছে। যদিও এতো বড় মাত্রার একটি সংঘর্ষ ইদানিংকালে ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু তবু পৃথিবীস্থ জীবনের প্রতি হুমকি হতে পারে এমন সকল জ্যোতিষ্ককে নজরদারিতে রাখাটা খুবই জরুরি। আগামী কয়েক বছরে, এক কিলোমিটার বা তার চেয়ে বড় সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ গ্রহাণুদের সকলকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এই কাজটি করবে নজরদারি কার্যক্রম চালানো বিভিন্ন স্পেস এজেন্সি, মানমন্দির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। এখন পর্যন্ত চিহ্নিত গ্রহাণুদের কোনোটিই পৃথিবীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

১১.৪ পৃথিবীর পরিবেশের উপর মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

শিল্পায়ন আধুনিক সমাজের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনলেও পৃথিবীর পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণও হয়েছে। নদী, সাগর ও বায়ুমণ্ডলের দূষণ ও ডিফরেস্টেশনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় নির্মল বায়ু, খাদ্য ও পানির উৎসগুলোর ক্ষতিসাধন করছি। প্রচুর সংখ্যক প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়েছে মানবসভ্যতা। এখনও মূল্যবান খনিজ ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী উৎসের সন্ধানে মানুষ সংকটাপন্ন পরিবেশে খননকার্য চালাচ্ছে। মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন (বৈশ্বিক উষ্ণায়ন) আমাদের পরিবেশকে বৃহৎ পরিসরে প্রভাবিত করছে এবং এর ফলে আমাদেরকে এবং অন্যান্য প্রজাতিকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

১১.৫ মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা জলবায়ু এবং বায়ুমন্ডল ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

আমাদের বায়ুমণ্ডলটি না থাকলে পৃথিবী -১৮° সেন্টিগ্রেড গড় তাপমাত্রার একটি তুষারিত গ্রহে পরিণত হবে। কিন্তু বাতাসে থাকা গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলি ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপকে আংশিক শোষণ করে নেয়, এবং এই তাপকে আবার ভূপৃষ্ঠের দিকেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখে। কিন্তু মানুষের নানা কার্যকলাপ বাতাসে প্রধান গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহের পরিমাণ ভীষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা পৃথিবীর শক্তি বাজেটে একরকম অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। এইসব গ্যাস বেড়ে গিয়ে অতিরিক্ত শক্তিকে পৃথিবীতেই আটকে রাখছে এবং গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই বাড়তি শক্তিকে অন্যান্য প্রাকৃতিক সিস্টেমের সাহায্যে পৃথিবী বিকিরণ করে খালাস করতে পারছে না। এটাই শক্তির ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে, ফলে বৈশ্বিক জলবায়ু প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে যা শক্তির বন্টনের উপর সংবেদনশীল।

১১.৬ আমাদের গ্রহটির সংরক্ষণে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন।

প্রতিটি মানুষই এই গ্রহের একজন বাসিন্দা। দায়িত্ব এবং তত্ত্বাবধায়নের বৈশ্বিক ধারণা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, আমরা প্রত্যেকেই, দলগত কিংবা এককভাবে, সক্রিয় হয়ে বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সক্ষম। আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য এই পৃথিবীকে আমাদের সংরক্ষণ করতেই হবে। এই মুহূর্তে, এই মহাবিশ্বে পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যা প্রাণধারণে নিশ্চিতভাবে সক্ষম।

১১.৭ জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের একটি অনন্য মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দেয়, যা পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

পৃথিবীর সকল মানুষ একই আকাশের নিচে বাস করে এবং ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে গভীর ভাবনার অধিকারী। মহাশূন্য থেকে তোলা বহু ছবিতেই 'ব্লু মার্বেল' হিসেবে দেখানো পৃথিবী নামক গ্রহটির হৃদয়গ্রাহী চিত্র আমাদের সার্বজনীন এই স্পেসশিপটির বিষয়ে গভীর অনুধাবন শিখিয়েছে। ওপর থেকে দেখলে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সীমারেখাও দূর হয়ে যায়। ভয়েজার-২ বা ক্যাসিনির মতো নভোযান থেকে তোলা ছবি আমাদের বুঝতে শেখায় 'নিষ্প্রভ নীলাভ বিন্দুটি' আসলে এই মহাবিশ্বের বিশালত্বের কাছে নিছক একটা কণিকামাত্র!

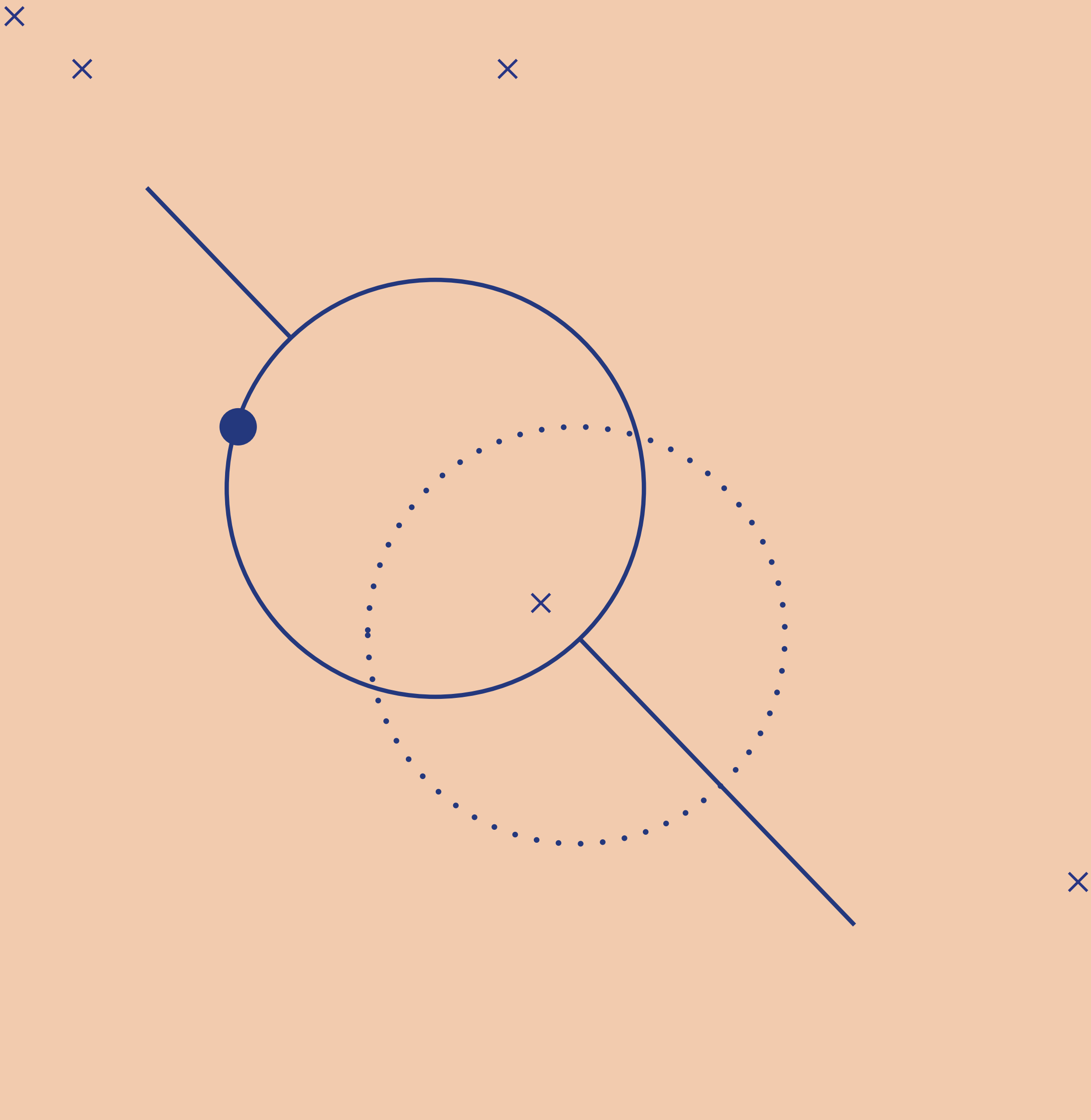

Universiteit Leiden
The Netherlands

ia
instituto de astrofísica
e ciências do espaço

IAU

IAU OFFICE OF ASTRONOMY FOR EDUCATION
OAE

9 789491 760266